দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

শতাব্দীবর্ষে
কাশী হিন্দু
বিশ্ববিদ্যালয়
.. পৃঃ ২১

পৃথিবীতে মোদী
একা নন, আরও
বহু নেতাই
বিদেশ সফর
করে থাকেন...
.. পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা || ১ জুন ২০১৫ || ১৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২২ || website : www.eswastika.com

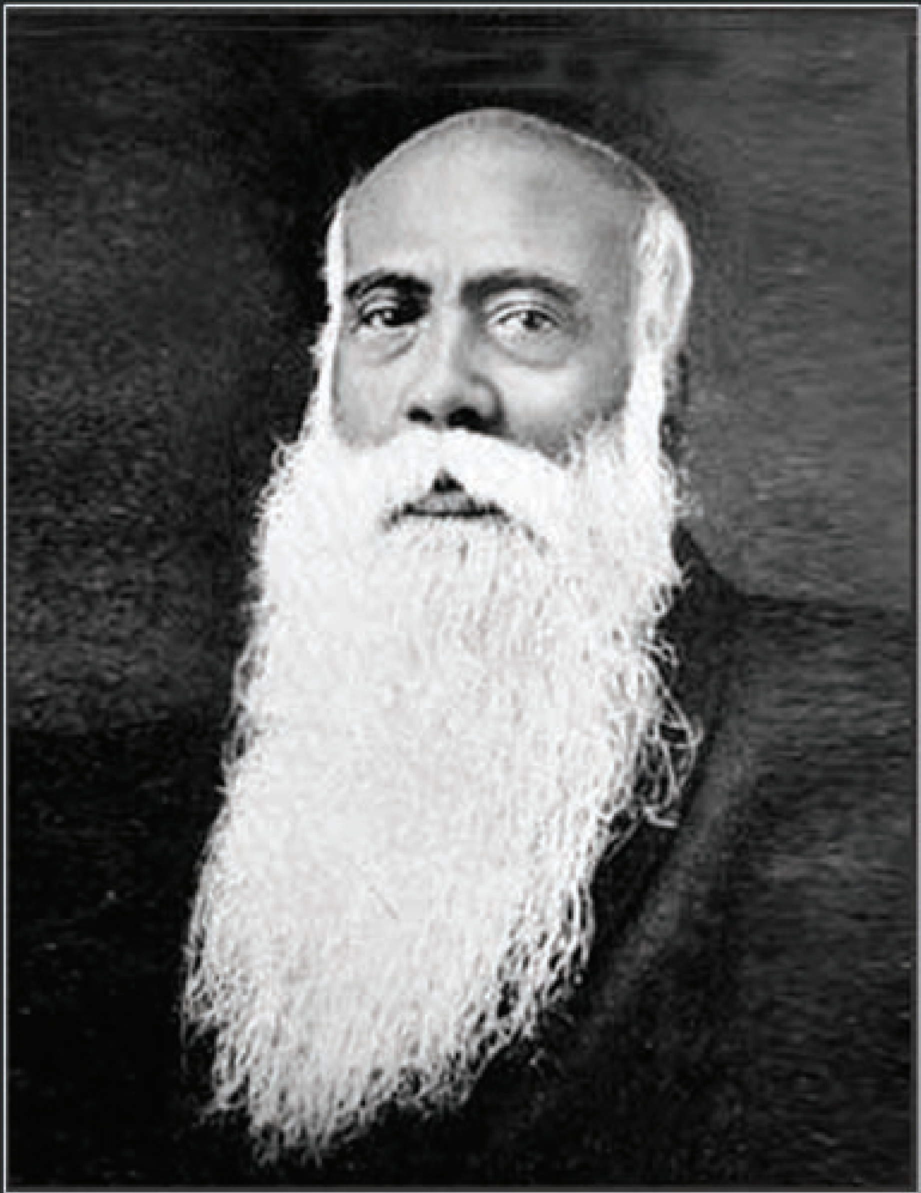

জন্মসার্ধশতবর্ষে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১ জুন - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

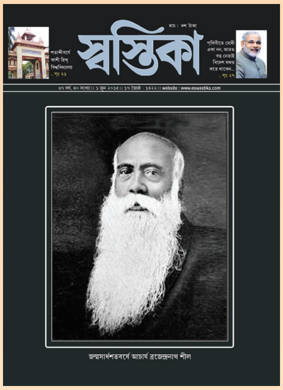

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সমকামী ও রূপান্তরকামীদের ভারতবর্ষের সমাজ মেনে নেবে না ▯ অভিরূপ নাগচৌধুরী ▯ ১০

খোলা চিঠি : ঝালমুড়িটা বড্ড মিষ্টি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব ▯ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল ▯ ১২

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল : মহৎ জীবন — বৃহৎ কর্ম ▯ অর্ণব নাগ ▯ ১৭

শতাব্দীবর্ষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ▯ অরুণ কুমার সিংহ ▯ ২১

পৃথিবীতে মোদী একা নন, আরও বহু নেতাই বিদেশ সফর করে থাকেন আর গালমন্দ খান ▯ চিদানন্দ রাজঘাট্টা ▯ ২৭

মানবতার জাগরণে শিক্ষা ▯ অধ্যাপক ধনঞ্জয় ঘোষ ▯ ২৯

পরিবেশ দূষণ এবং আমাদের কর্তব্য ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭** ▯ **রঙ্গম : ৩৮-৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদী সরকারের বর্ষপূর্তি

সাম্প্রতিক কিছু জন-সমীক্ষাই জানিয়ে দিচ্ছে, মোদী-ম্যাজিক তার বর্ষপূর্তিতেও অটুট। কংগ্রেস সরকারের প্রতি দেশবাসীর চরম অনাস্থা যে মোদী-সাইক্লোনের অন্যতম মাধ্যম ছিল, বছর ঘুরতে মোদী সরকারের আস্থা-জাগানো ও কথা-রাখা কর্মকাণ্ডই কি সেই সাইক্লোনের প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে? আবেগ ছেড়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে মোদী সরকারের এক বছরের কার্যকলাপ। বিশ্লেষক— অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি চৌধুরী, অম্লানকুসুম ঘোষ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাত পুরসভার ভোট ও গণতন্ত্র

পশ্চিমবঙ্গে সাতটি পুরসভার নির্বাচনের বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার রিট পিটিশন দায়ের করিয়াছিল। এই রিট পিটিশনের শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট জানাইয়া দিয়াছে যে সাতটি পুরসভার সংযুক্তিকরণের কাজ রাজ্য সরকারকে ৩০ জুনের মধ্যে শেষ করিতে হইবে এবং তাহার পরই সাতটি পুরসভার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা যাইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর-এর নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করিয়া দিয়া এক রায়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আগামী ১৬ জুনের মধ্যে ওই সাতটি পুরসভার নির্বাচন করাইতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেয়। এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায় জানাইয়া দিয়াছেন, পুরসভাগুলির পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কাজকর্ম শেষ করিয়া ৩০ নভেম্বরের আগে ভোট করানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ বালি, কুলটি, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল, বিধাননগর, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভার নির্বাচন আর আলাদাভাবে হইবে না। বালি পুরসভা হাওড়া পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। বিধাননগর ও রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা সম্মিলিত হইয়া একটি পৃথক পুরনিগম এবং কুলটি, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া এই তিনটি পুরসভা আসানসোল পুরনিগমের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এই সমগ্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। কেননা পুরনিগমগুলি গঠিত হওয়ার পর রাজ্য সরকার স্থির করিবে কোন পুরনিগমে কয়টি ওয়ার্ড থাকিবে। সেই সিদ্ধান্ত জানিবার পরই কমিশন ওইসব নিগমের ওয়ার্ড সীমানা পুনর্বিন্যাস করিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে। এইসব প্রক্রিয়ার শেষে পুর নিগমগুলির ভোট না হওয়া পর্যন্ত সাতটি পুরসভা এলাকার নাগরিকরা নির্বাচিত পুর প্রতিনিধি পাইবেন না। কেননা তখন রাজ্য সরকারের নিযুক্ত প্রশাসকই কাজ চালাইবেন। ইহাতে পুর পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকিয়া যাইতেছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বদান্যতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারই শেষ হাসি হাসিয়াছে। রাজ্য সরকার যাহা চাহিয়াছিল তাহাই হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের সাতটি পুরসভার নির্বাচন বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের যুক্তির কোনো বিরোধিতাই করে নাই কমিশন। বর্তমান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায় যে শাসকদলের হাতের পুতুল হইয়া কাজ করিয়াছেন— বিরোধীদের এই অভিযোগ ঘটনাটিতে আরও একবার প্রমাণিত হইল। সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশে গণতন্ত্রের পরাজয় হইল। আদালতের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াও বলা যায়, এই রায় খুব দুঃখজনক, গণতন্ত্রের পক্ষে উদ্বেগজনক।

সুভাষিতম্

ঈর্ষা ঘৃণা ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ।। (চাণক্যনীতি)

দ্বেষযুক্ত, ঘৃণাকারী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, সব সময় ভীত এবং যে পরের ভাগ্যে (দয়ায়) বেঁচে থাকে—এই ছয়জন চিরকাল দুঃখ ভোগ করেন।

আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ভারতভুক্ত করার দাবি নিয়ে কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি দিল্লীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা।। গত ৬ মে রাজ্যসভায় ও ৭ মে লোকসভায় বিতর্কের পর ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তি রূপায়ণের জন্য ১১৯তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাশ হয়ে গেল। সংসদের উভয় কক্ষে অনেকেই এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করলেও কেবলমাত্র দার্জিলিং-এর সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া লোকসভায় দাঁড়িয়ে কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির 'তিনবিঘা করিডর বিলুপ্ত করে বাংলাদেশি ছিটমহল অঙ্গারপোতা দহগ্রাম ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার' দীর্ঘ মেয়াদি দাবির কথা উল্লেখ করেন। শ্রী আলুওয়ালিয়া কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দাবি নিয়ে করে আসা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, এই আন্দোলনে তিন জন মানুষ শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন, বহু মানুষ আহত ও ঘরছাড়া হয়েছেন। শ্রী আলুওয়ালিয়া ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে ভারতীয় জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির আরো দুটি দাবি তেতুলিয়া করিডর ও মাথাভাঙ্গা- মেখলিগঞ্জ পুরনো ইমিগ্রেশন রোড চালু করার বিষয়ও সংসদে রাখেন। (১) তেতুলিয়া করিডর চালু হলে কলকাতার সঙ্গে গোটা উত্তরপূর্ব ভারতের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে। কারণ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া মোড় থেকে শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যেতে ১১০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। চোপড়া মোড় থেকে তেতুলিয়া হয়ে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যেতে দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে মাত্র ২৭ কিলোমিটার। (২) মাথাভাঙ্গা থেকে মেখলিগঞ্জ ভায়া চ্যাংরাবান্দা ৫৬ কিলোমিটার, কিন্তু পুরনো ইমিগ্রেশন রোড হয়ে মাথাভাঙ্গা থেকে মেখলিগঞ্জ যেতে মাত্র ২৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

শুধু কুচলিবাড়ি নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষ আশা করেছিল ভারতীয় সংসদ হয়তো ভারতের স্বার্থের অনুকূল সংগ্রাম কমিটির এই দাবি দাওয়া নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবে। কারণ তিনবিঘা করিডর ও আঙ্গারপোতা দহগ্রাম যে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপদ এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। জেহাদি, সন্ত্রাসবাদী, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের যাতায়াত ও গো-পাচার থেকে শুরু করে ভারত-বিরোধী সমস্ত ধরনের ক্রিয়াকলাপের পীঠস্থান এই বাংলাদেশি ছিট আঙ্গারপোতা দহগ্রাম। কারণ তিনবিঘা করিডর হয়ে আঙ্গারপোতা দহগ্রামের মধ্য দিয়ে মহকুমা শহর মেখলীগঞ্জে ঢুকে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। তাছাড়া তিনবিঘা করিডর চালু থাকার ফলে প্রায় ১৬ হাজার একর আয়তন বিশিষ্ট কুচলিবাড়ি এলাকা বাংলাদেশ ঘেরা এক ছিটমহলে পরিণত হয়েছে। ২০১১ জনগণনা অনুসারে কুচলিবাড়ির জনসংখ্যা ২৩৪৫৬ জন, অথচ ১৯৮১ এর জনগণনায় এই সংখ্যা ছিল ৩৫০০০ এর মতো। স্পষ্টতই এই এলাকা থেকে ক্রমশই মানুষ সরে আসছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে কুচলিবাড়ি কাগজে-কলমে না হলেও বাস্তবে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

এখন থেকে ৪০ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ বনাম ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সঙ্গে করা চুক্তি অবিকৃতভাবে বর্তমান ইসলামিক বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় সংসদে পাশ হতে দেখে ক্ষুব্ধ ব্যথিত কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক গিরিনাথ রায়, অন্যতম কর্মকর্তা অশ্বিনী কুমার রায়, দীপেন প্রামাণিক, সাধন কুমার পাল ও অমলেন্দু চ্যাটার্জী-সহ ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গত ১১ মে তড়িঘড়ি দিল্লী ছুটে যান। তাঁরা ১২ মে দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ওইদিন সন্ধ্যায় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'তিনবিঘা করিডর বিলুপ্ত করে বাংলাদেশি ছিটমহল আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ভারত ভুক্ত করার লক্ষ্যে' বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি

শিলিগুড়িতে সাংসদ আলুওয়ালিয়ার উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সিতারামণের সঙ্গে কথা বলছেন কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিরা।

বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন সাধন কুমার পাল।

করার দাবিপত্র তুলে দেন। উল্লেখ্য, কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি মনে করে, বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের পর শুধু ভারতের নয়, বাংলাদেশের নিরাপত্তার দৃষ্টিতেও অত্যন্ত বিপজ্জনক তিনবিঘা করিডর বিলুপ্ত করে সীমান্ত সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। ১৯৯২ সালে ২৬ জুন তিনবিঘা হস্তান্তর হওয়ার পরেই যে ভাবে আঙ্গারপোতা দহগ্রামের হিন্দু বাসিন্দাদের বাড়িঘর লুটপাট করে সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন বর্তমান ছিট বিনিময়ের পর না ঘটে সে বিষয়ে সংগ্রাম কমিটি কেন্দ্র সরকারকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করে। আঙ্গারপোতা দহগ্রাম-সহ ভারতীয় ছিটমহল থেকে বিভিন্ন সময় উদ্বাস্তু হয়ে আসা প্রত্যেকের জন্য পুনর্বাসন প্যাকেজ ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। বহু অত্যাচার সয়ে এখনো যে সমস্ত প্রকৃত ভারতীয় বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিটগুলিতে বসবাস করছেন তাঁদের পুনর্বাসন প্যাকেজ ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদা সহকারে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের আর্জি জানানো হয়। সেই সঙ্গে দাবি জানানো হয় এই প্রক্রিয়ায় যাতে একজন বাংলাদেশিও ভারতে ঢুকে পড়তে না পারে সে রকম নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

সূত্রে প্রকাশ, কমিটির প্রতিনিধি দলের ইচ্ছে ছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবি ও আন্দোলনের কথা তুলে ধরার। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে সময় চীন যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তা আর হয়ে উঠেনি। তবে গত ১৬ মে উত্তরবঙ্গ সফরের সময় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার হোটেল বর্ধানায় গিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামনের হাতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি ও দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে ভুয়ো পরিচয়পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছিট বিনিময়ের পথ সুগম হতেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে উঠে পড়ে লেগেছে। নানান জাল কাগজপত্র জোগাড় করে তারা নিজেদের ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দা হিসেবে দাবি করছে। সূত্রের খবর, এই দুষ্কৃতীদের বড় অংশ বাংলাদেশের সমাজবিরোধী ও চোরাচালানকারী। এই কাজে সহযোগিতার জন্য একটা চক্র মোটা টাকার বিনিময়ে জাল কাগজপত্র জোগাড় করে দিচ্ছে। বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ছিটমহলেই এই চক্র বেশ সক্রিয়। গোয়েন্দা সূত্রের মতে, ভুয়ো পরিচয়পত্র নিয়ে ইতিমধ্যে বহু বাংলাদেশি দুষ্কৃতী ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে।

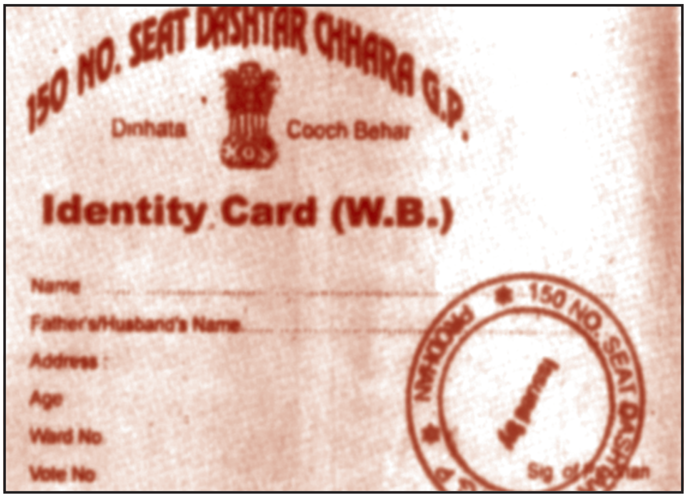

দুষ্টচক্রের তৈরি ভুয়ো পরিচয়পত্র।

বিশেষ সূত্রে খবর, দিল্লী ও গুয়াহাটি থেকে আসা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদপ্তরের একটি বিশেষ দল অত্যন্ত গোপনে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে যে, ভারতীয় ১৫০ নং দাশিয়ারছড়া ছিটমহলেই এই ভুয়ো পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ চলছে। পাশাপাশি আরো কয়েকটি ছিটমহলেও এই কাজ চলছে। চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, ছিটমহলের নাম, ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ছবি-সহ অশোকস্তম্ভের ছাপ দিয়ে এই ভুয়ো পরিচয় দেওয়ার কাজ চলছে। বহুদিন আগে থেকেই এই চক্র সক্রিয়।

গোয়েন্দাসূত্রে খবর, ছিটমহল বিনিময় বিল ভারতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পরই ভুয়ো পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যাপারটি বেড়ে গিয়েছে। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। তদন্তকারী গোয়েন্দাদের মতে, বিস্তারিত রিপোর্ট দিল্লী ও ঢাকাতে পাঠানো হয়েছে। অপরাধচক্রের ১৫০ জনের নামধাম-সহ তালিকা তৈরি হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ হতেই ভারতীয় ভূখণ্ডের জনসাধারণ খুবই উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সন্ত্রাসবাদ দমনে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে মোদী সরকার : পারিক্কর

মনোহর পারিক্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২১ মে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর এক বেসরকারি টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বেশ জোরের সঙ্গে জানান, পূর্বের ইউপিএ সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি। কিন্তু বর্তমান মোদী সরকার এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তিনি বলেন, দেশের পক্ষে বিপজ্জনক শক্তিকে রুখতে অতি সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে। আর তা করার জন্য কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। বিষয়টিকে তিনি খোলসা করে বলেন, যদি কোনো দেশ আমাদের দেশের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে তাহলে আমাদের অতি সক্রিয় পদক্ষেপ নিতেই হবে। সেটা কখনো কূটনৈতিক চাপ দিয়ে, কখনো সন্ত্রাসবাদীদের দিয়েই সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতে হবে। তাঁর দাবি, একমাত্র তাঁদের সরকারই সেনা-বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ দমনে। সেনাবাহিনী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি নজরে আনতে পারছে এবং সেভাবেই আঘাত হানছে। সেনাবাহিনীর পাশে এই সরকার আছে।

শ্রী পারিক্কর জানান, সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আমাদের দেশের জীবন ও সম্পত্তিহানি আর বরদাস্ত করা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় অন্যদেশের নিরীহ মানুষ ও সম্পত্তির হানি যাতে কম হয় সে বিষয়েও সেনাবাহিনী নজর রাখবে।

মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় সফল সফর মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীর ত্রিদেশীয় সফরে চীন নিয়ে বিস্তর চর্চা হলেও মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও তিনি যে সফল হয়েছেন তা দেশের ওয়াকিবহাল মহল স্বীকার করে নিয়েছেন। এই প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মঙ্গোলিয়া গেলেন। এই সফরে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী যে দৃঢ় তা প্রমাণিত হলো। মঙ্গোলিয়ার কৌশলগত অবস্থানে গুরুত্ব দিয়ে নতুন দিল্লী ও উলান ব্যাটোর কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে মঙ্গোলিয়াকে ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ হিসেবেও দিয়েছে। ডেয়ারি সমবায় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও মঙ্গোলিয়াকে সাহায্য করবে বলে ভারত জানিয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ভারতও আজ উৎপাদন ও পরিষেবার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করছে। সিউল ও দিল্লীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তা বুঝেই ত্রিদেশীয় সফরে দক্ষিণ কোরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শ্রীমোদীর এই সফরের ফলে দক্ষিণ কোরিয়া ভারতীয় রেল, স্মার্ট সিটি এবং শক্তি উৎপাদনের কলাকৌশলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলেও জানিয়েছে। ভারতের পুরনো অস্ত্র কারখানাগুলির আধুনিকীকরণের কাজে সহযোগিতা করবে বলে দক্ষিণ কোরিয়া আশ্বাস দিয়েছে। ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির কার্যকর করতে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম সহায়ক দেশ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নাগাল্যান্ডে সন্ত্রাসবাদী হামলা বেড়ে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নাগাল্যান্ড আবার সন্ত্রাস কবলিত। সন্ত্রাসবাদীরা বেছে বেছে সুরক্ষাবাহিনী জওয়ানদেরই নিশানা করছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্র সরকার ন্যাশনাল সোশালিস্ট অব নাগাল্যান্ড খাপলাং (এন এস সি এন)-এর রাষ্ট্রবিরোধী দাবি না মানার জন্য এমন হচ্ছে। এর ফলে এন এস সি এন দীর্ঘ ১৪ বছরের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করলো।

গত এপ্রিল মাসেই একের পর এক হামলা করে সন্ত্রাসবাদীরা সুরক্ষাবাহিনীর জওয়ানদের হত্যা করে। গত ১৫ এপ্রিল কোহিমায় অসম রাইফেলস-এর ১৯ জওয়ানকে হত্যা করে। ৩ মে এন এস সি এন-এর সন্ত্রাসবাদীরা ২৩ নং অসম রাইফেলসের 'সি' কোম্পানির ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৮ জওয়ানকে হত্যা ও ৯ জওয়ানকে গুরুতররূপে ঘায়েল করে। একটি ট্রাকে করে নাগাল্যান্ডের মোন জেলার তোবু টাউন থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সৈনিকরা জল আনতে যাওয়ার সময় ১৪৮ নং আউটপোস্টের কাছে দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালায়। ৩ জওয়ান সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। হামলার খবর পেয়ে সেনার অন্য দল সেখানে গেলে তাদের ওপরও হামলা হয়। তাতে ৫ জওয়ান মারা যায়। সন্ত্রাসবাদীরা সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। এই লড়াইয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ১ জন মারা যায় ও ১ জন ঘায়েল হয়।

তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, যদি সময় থাকতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

সংবাদ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই দখল করেছেন হিন্দু জমিদারবাড়ি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ফরিদপুর ঝিলটুলিতে রাজেন্দ্র কলেজের হিন্দু হোস্টেলের বিপরীতে অবস্থিত বাড়িটির নাম দয়াময়ী আশ্রম। রাজেন্দ্র কলেজর প্রতিষ্ঠাতা ভাজনডাঙ্গার জমিদার সতীশচন্দ্র গুহ মজুমদারের বাড়ি। তার পাশেই বর্তমান প্রবাসকল্যাণমন্ত্রী মোশাররফ হোসেনের বাড়ি। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই। হাসিনার মেয়ে পুতুলের শ্বশুর। এই জমিদার পরিবারের বদান্যতায় মোশাররফ হোসেনের পূর্বপুরুষ এখানে জায়গা পেয়ে বাড়ি তৈরি করেন।

ওই জমিদার পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য অরুণ গুহ মজুমদার, তাঁর একমাত্র মেয়ে তুলি মজুমদার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। অরুণবাবু ও মোশাররফ বাল্যবন্ধু। তারপরও এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে মোশাররফ হোসেন জমিদার বাড়িটিকে শত্রু সম্পত্তি করে রেখেছিলেন, যা এখন অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত। প্রায় তিন একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত বাড়িটির মূল্য বর্তমানে কয়েক কোটি টাকা। পুরনো দ্বিতল ভবন ও একটি মন্দির। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন অনুযায়ী ফেরত দানের প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে বাড়িটি সেই কালো আইনের কবলমুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শত্রু সম্পত্তি হওয়ার কারণে জেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় দীর্ঘদিন বাড়িটির কোনো সংস্কার হয়নি। অভিযোগ হলো, মোশাররফ সাহেব ক্ষমতা ব্যবহার করে জেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে চাপে রাখেন। তিনিই বাড়িটি গ্রাস করতে 'অবমুক্ত' করাচ্ছেন।

গত ১৩ এপ্রিল সকালে মোশাররফ সাহেব দলবল নিয়ে এসে অরুণবাবুকে উৎখাত করেন। বন্ধুর কান্নাকাটিতে তাঁর মন গলেনি। পরে অরুণবাবুকে সপরিবারে পাশে আর একটি হিন্দু বাড়িতে নিয়ে তোলেন। এই বাড়িটিও কিছুদিন আগে পরিবারের লোকজনকে হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে তিনি দখল করেছেন। কয়েকদিন আগে অরুণবাবুকে দিয়ে মোশাররফ সাহেবের উকিল একটি বায়নানামায় সই করিয়ে নিয়েছেন জোর করে। আদালত প্রাঙ্গণে ডেকে নিয়ে সবার সামনেই রক্তচক্ষুর মুখে বায়নায় সই করানো হয়। উপস্থিত সবাই নির্বাক দাঁড়িয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বেয়াইকে কিছু বলার সাহস কারো হয়নি। প্রশাসন ছিল নিশ্চুপ। অরুণবাবুকে কোনো টাকাপয়সাও দেওয়া হয়নি। বাড়িটি দখলের পর মোশাররফ সাহেব মন্দিরটি ভেঙে ফেলেছেন। এখন অরুণবাবু পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভাজনডাঙ্গায় যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল সেখানেই রয়েছেন অনেকটা গৃহবন্দীর মতো। বাড়িটি ঘিরে রেখেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মোশাররফের লোকজন। এমনকী অরুণবাবু মোবাইলে কথা বলতেও পারছেন না। মেয়েকেও বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, আইনি প্রক্রিয়ায় যতদিন সময় লাগবে ততদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে অরুণবাবুকে। তারপর সম্ভবত তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলা হবে, অরুণবাবু স্বেচ্ছায় বাড়িটি বিক্রি করে কোথাও চলে গেছেন। এ ব্যাপারটি জানিয়ে গত ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ এখনো চোখে পড়েনি। বাংলাদেশ বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ-এর ফরিদপুর জেলা নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন, কিন্তু প্রশাসনও রাজনীতির কাছে নির্বাক। তাঁরা ঘটনা স্বীকার করে বলেছেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর আপন বেয়াই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে, সেখানে তারা কি করবেন? হিন্দুদের মধ্যে এ ঘটনায় চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ■

দখলীকৃত সতীশচন্দ্র গুহ মজুমদারের বাড়ি।

সমকামী ও রূপান্তরকামীদের ভারতবর্ষের সমাজ মেনে নেবে না

অভিরূপ নাগচৌধুরী

বিষয়টি আবার বেশ কিছুদিন ধরেই সামনে আসছিল। তবে বে-আব্রু হয়ে পড়ল আয়ার্ল্যান্ডে গণভোটের মাধ্যমে সমকামী বিবাহ স্বীকৃত হওয়ায়। এখন ভারতেও এই দাবি উঠবে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই সমকামীদের নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য একটি নামী সাহিত্য পুরস্কারও জুটেছে এক সাহিত্যিকের। একজন রূপান্তরিত 'মহিলা' কলেজের 'অধ্যক্ষা'ও হয়ে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে ভারতে সমকামিতার স্বীকৃতি'র দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার হলো বলে! এখন প্রশ্ন, এহেন আন্দোলন এদেশীয় সমাজে কোনো প্রভাব ফেলবে কি? সোজা উত্তর না। সামাজিক দাদাগিরি কিংবা নিজের মত অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার বিষয় এটি নয়। ভারতবর্ষের যে সামাজিক কাঠামো তাতে এধরনের গণভোট কোনোদিনই সম্ভব নয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই এদেশে সমকামিতা নিয়ে গণভোট হলো, তবে 'হ্যাঁ'-পন্থীরা নিশ্চিতভাবেই মুখ থুবড়ে পড়বেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে, রক্ষণশীল ক্যাথলিক আয়ার্ল্যান্ডের সমাজ যেখানে সমকামিতাকে স্বীকৃতি দিতে পারল, হ্যাঁ বিপুল ভোটের ব্যবধানেই, সেখানে ভারতবর্ষীয় সমাজ কেন তা দিতে পারবে না?

সব বিষয়ে গণভোট বাঞ্ছনীয় কিনা, সে প্রশ্ন আপাতত মুলতুবি রেখে বলতে হচ্ছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার যে সামান্য প্রভাব এদেশে পড়েছে, তার সবটাই শহর-কেন্দ্রিক। ভারতবর্ষের গ্রাম আজও তার প্রাচীন পরম্পরা টিকিয়ে রেখেছে। সেখানে সন্ধেবেলা শহুরে ব্যস্ততা সরিয়ে এখনও শাঁখের আওয়াজ শোনা যায়। গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিকীকরণের যুগেও সাঁঝের বেলায় প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব গ্রামই যে বর্তমান যুগের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক প্রাচীন কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবেশ করেছে যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা-দীক্ষা, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা। ফলে ভারতের গ্রাম এখন অনেক আধুনিক। কিন্তু প্রাচীন রীতি-নীতি পরিত্যাগের কোনো বাসনা তাদের আছে এমন কোনো প্রমাণ কিন্তু নেই। এমনকী শহরেও যেখানে পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাসের সুযোগ মাত্রাতিরিক্ত সেখানেও ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। পেশার তাগিদে যাঁরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন নিজের দেশের ঐতিহ্যকে ভুলেছেন তাঁরা ক'জন?

> **সুখী পৃথিবীর জন্য সংযম দরকার— অসংযমী জীবন যে আমাদের কতটা অসুখী করে তা আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এধরনের মনোবিকৃতির হাত থেকে আমাদের অবিলম্বে রেহাই পাওয়া দরকার— মানবসমাজের স্বার্থেই।**

এইসব প্রশ্নগুলো আজ সচেতনভাবেই উঠবে। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু 'ভোগ নয়, ত্যাগেই সুখ' এই নীতিতেই বিশ্বাসী নয়, একইসঙ্গে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যে কোনোও কাজকর্মেরও বিরোধী। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমকামিতা কিংবা রূপান্তর-কামিতাকে যৌন কদাচার ছাড়া আর কি বলা চলে? অত্যাধুনিকতার দোহাই দিয়ে যেমন একে কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না, তেমনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার অজুহাতেও একে মেনে নেওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে, এই ধরনের বিরুদ্ধাচারণ প্রকৃতি কোনোদিন সহ্য করবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ধ্বংস অনিবার্য। যৌন কদাচারের স্বাধীনতাই আধুনিকতা, আর সংযমী জীবন-যাপন মানে পশ্চাদ্‌পদতা— এই সরলীকরণে বিশ্বাস রাখার কোনো কারণ নেই। সুখী পৃথিবীর জন্য সংযম দরকার— অসংযমী জীবন যে আমাদের কতটা অসুখী করে তা আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এধরনের মনোবিকৃতির হাত থেকে আমাদের অবিলম্বে রেহাই পাওয়া দরকার— মানবসমাজের স্বার্থেই। আয়ার্ল্যান্ড গণভোটে গেল কোনো যুক্তিতে বোঝা মুশকিল। দেশের নিরাপত্তা স্বার্থ যেমন কোনো যুক্তিতেই জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়বদ্ধতাও কোনো অজুহাতেই বিসর্জন দেওয়া যায় না। তাই সমকামী বিবাহ বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে গণভোট অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। ভোগবাদ যে সভ্যতাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে সেখানে এধরনের গণভোটে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলাই বাহুল্য। অপরিণত ও অদূরদর্শী মানসিকতা যে কোনো সামাজিক ব্যবস্থার ওপর চূড়ান্ত খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আয়ার্ল্যান্ড তার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

ঝালমুড়িটা বড্ড মিষ্টি...

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

যত খারাপই লাগুক এ রাজ্যে মমতা রাজত্ব আপনাকে মেনে নিতেই হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক রাজনীতিকের প্রতিটি চালকে বিশ্লেষণ করুন দেখবেন মনের কষ্ট লাঘব হবে। সদ্য রাজপথে একসঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঝালমুড়ি ও ভেলপুরি খেয়ে বিপাকে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তারও আগে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঘরছাড়াদের ফেরানোর দাবি জানাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবেন দিদির কেরামতি। সেবার তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর দিকে দিকে অত্যাচারে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকরা ঘরছাড়া। বাম নেতারা গেলেন। দিদি সেখানে সৌজন্যের চূড়ান্ত রূপ দেখিয়ে নিজে হাতে গৃহকর্ত্রীর মতো প্লেটে ফিসফ্রাই, সন্দেশ সাজিয়ে, দার্জিলিংয়ের স্পেশাল চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে ইস্যুটাকেই ঘুরিয়ে দিলেন। কটা দিন রাজ্য রাজনীতিতে ওটাই হয়ে উঠল আলোচ্য। চাপা পড়ে গেল ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরার দাবি। ঘর সামলাতে মরিয়া হয়ে উঠল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

ঠিক একই অঙ্ক কষে ফের পাশ করলেন দিদি। এবার পুরভোটের পর দিকে দিকে বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত। রামজীবনপুরে বিজেপি কোনোক্রমে একটা পুরবোর্ড দখলের জায়গায় পৌঁছেও গিয়েছিল, অন্তত সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় সব ইস্যু গোলমাল করে দিয়ে ঝালমুড়ি-ভেলপুরি ইস্যু দিয়ে বাজার গরম করে দিলেন দিদি। কোনো নেতা কর্মী লাগল না। কটাদিন বিজেপি নেতৃত্ব বাবুলের সৌজন্য রক্ষার সাফাই দিতে কাটিয়ে দিল। সেই ফাঁকে দলীয় কর্মীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ল। রামজীবনপুরের নির্দল নির্বাচিতদের ফুসলিয়ে নিয়ে চলে গেল তৃণমূল কংগ্রেস।

মনে করুন সেই দিনটার কথা, যেদিন রেল ভাড়া বাড়ালেন দীনেশ ত্রিবেদী। কংগ্রেস ছাড়া সব দলই আন্দোলনে নামার জন্য তৈরি। রেল রোকা হবে, তৃণমূলের মুণ্ডপাত হবে চ্যানেলে। চ্যানেলে, তার জন্য হোমওয়ার্ক চলছে। হঠাৎ সব আয়োজন ছারখার করে দিয়ে সব আলো কেড়ে নিলেন, সব ফোকাস নিজের দিকে নিয়ে নিলেন দিদি। সবার আগে নিজের দলের বাজেটের বিরোধিতায় নেমে গেলেন তিনি নিজে।

একেই বলে রাজনীতি। প্রথমে কোণঠাসা হয়ে যাও। বিরোধী শিবির বল নিয়ে দৌড়াক মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। যেই না তারা হাঁফিয়ে উঠবে তক্ষুনি একটা সুন্দর থ্রো বাড়িয়ে দিতে হবে বিরোধীর পেনাল্টি বক্সে। তার পর স্ট্রাইকারের নিঁখুত চালে---গো-ও-ও-ও-ল। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় দেশের সব দলই মোদীকে নানা অস্ত্রে বিঁধেছেন। তবে সব চেয়ে বেশি বিঁধছেন মমতা। ব্যক্তিগত স্তরে নেমে হরিদাস পালকে কোমরে দড়ি পড়ানোর হুমকিও দিয়েছেন। মোদী হাওয়ায় তখন তিনি রীতিমতো কোণঠাসা। মোদী রাজ্যে এসে বললেন, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর কথা। লুফে নিলেন মমতা। রাজ্য বিজেপির গতি যদি শব্দের সঙ্গে তুলনীয় হয় তবে তৃণমূলের গতি আলোর মতো। সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তাই নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষের সামনে পৌঁছনোর অনেক আগেই দিদির প্রচার চলে গেল মানুষের কানে কানে— পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সব মানুষকেই নাকি তাড়াবে মোদী সরকার। বলতে দ্বিধা নেই, সেই প্রচার কাজে এসেছিল। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোয় বিজেপির ফল যতটা ভালো আশা করা হয়েছিল ততটা হয়নি।

এবার বিধানসভা ভোট আসছে। অনেক দিন অপেক্ষা করার পর সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোদী সাক্ষাৎ সেরে ফেলার পর এই সময়টাকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেছে নিলে সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য। তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হলো? সেটা তো রুদ্ধদ্বার কক্ষের দেওয়াল শুধু জানে। কিন্তু তৃণমূলের প্রচেষ্টায় সংগঠিত মিডিয়া একটা বোঝাপড়ার প্রচার চালিয়ে দিল। সেটা রমরমিয়ে চলছে। ফলে সম্ভাবনাময় বিজেপি কার্যত ব্যাকফুটে।

এরপর বিজেপি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের এক বছর পূর্তির সাফল্য তুলে ধরবে সেই সময়েই মমতা রাজনীতি ঝালমুড়ির আমদানি করল। এ চালও মোক্ষম!

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা সজাগ হোন। দিদির ফাঁদ পাতা এই বঙ্গে বিরোধী রাজনীতিকরা যতদিন না পা দেওয়া বন্ধ করছেন ততদিন ইচ্ছে না থাকলেও দিদিকে মেনে নিতেই হবে। ভালো থাকতে চাইলে তৃণমূল জমানার খারাপ থাকাটা উপভোগ করুন।

— **সুন্দর মৌলিক**

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব

ব্রজেন্দ্র নাথ শীল

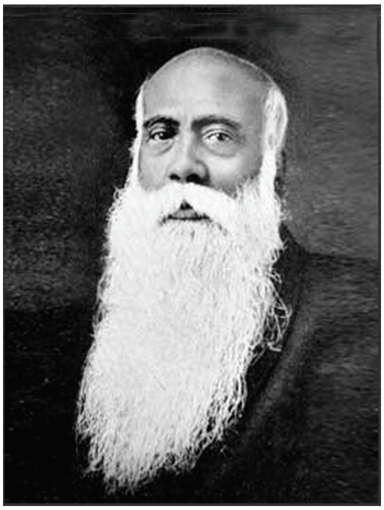

আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল

"হিন্দুর দর্শন চিরদিনই এই একত্বের অন্বেষণ করিয়াছে। এই একত্বানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই সহজ বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দু সর্ব্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্যই বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে।"

যুরোপীয় এবং ভারতীয় সাধনা

যুরোপ যত বড় হউক না কেন, তার বাহিরেও যে একটা আরও বড় জগত আছে, যুরোপের সভ্যতা ও সাধনাই যে জগতের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনা নয়, অথবা চীনের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা যে বিশ্ব-মানবের শৈশব-লীলা মাত্র ছিল, তার পরিপূর্ণ যৌবন-লীলা প্রথমে যুরোপেই হইতেছে, এ সকল কথার ভ্রান্তি ক্রমে ধরা পড়িয়াছে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, সমষ্টিগত মানব সমাজের সভ্যতা ও সাধনা একটা সরল রেখার ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশের বা ইভোলিউশনের ধারাকে ফরাসী পণ্ডিত লা মার্ক এই ভাবেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সে ভুল খণ্ডন করিলেও, আজিকালিকার সমাজ-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রমবিকাশে সেই লামার্ক-কল্পিত ক্রমই দেখিতেছে। চীন একদিন কতকটা পরিমাণে একটা বিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতা ও সাধনা গড়িয়া তুলিয়া ছিল; তারপর চীনের বিকাশক্রম চিরদিনের মতন থামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে একটা অত্যদ্ভুত সভ্যতার ও সাধনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; কিন্তু সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই। মানবপ্রকৃতির ও মানবের সভ্যতার এবং সাধনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দেখিতে হইলে, এখন যুরোপের গ্রীক্-রোমক্ গথিক্-হিব্রু-খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সাধনারই আলোচনা করিতে হইবে। যুরোপের জনসাধারণের ত কথাই নাই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যেও চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এই ধারণা প্রবল রহিয়াছে। এই ভ্রান্তিটা দূর করিবার জন্য ভারতের সভ্যতা ও সাধনা বিশ্বমানবের উন্নতি কল্পে কতটা কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, তার আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয়েরাই যে কেবল এ সকল তত্ত্বের সন্ধান্ রাখেন না, তাহা নহে। আমরাও ভাল করিয়া এ সকল কথা জানি না। আমাদের স্বদেশাভিমান এবং এই স্বদেশাভিমান হইতে যে স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বত্রই জাগিয়া উঠে, সেই পক্ষপাতিত্বের বা পেট্রিয়টিক বায়সের (Patriotic bias'এর) প্রভাবে আমরা আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনাকে জগতের অপর সকল সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে। যুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, যুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে যা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এ বিষয়ে যুরোপের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়েই স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। উভয়ের বিচারই সেই জন্য সত্য-ভ্রষ্ট। উভয়েই সভ্যাভাস মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সত্যকে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশ্বমানব

সত্য কথা কিন্তু এইযে বিশ্বমানব বিশ্বব্যাপী। ছোট বড়, পুরাতন ও অধুনাতন, য়ুরোপ আসিয়া আফ্রিকা ও মার্কিণ, সকল জ্ঞাত মহাদেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বিশ্ব-মানবের অথবা নর-নারায়ণের লীলাভূমি হইয়া আছে। সে লীলা বিশ্বব্যাপী লীলা।

এই লীলাময় বিশ্বমানব এক অখণ্ড বস্তু বা তত্ত্ব। সকল মানবে ও সকল মানব সমাজেই ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অব্যক্তরূপে তিনি কোথাও পরিপূর্ণ নহেন। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতা, কোনও সাধনা, এই বিশ্বমানবের বা Universal Humanity'র আত্মবিকাশ- ধারার একটী বা দুইটী বা তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ (moments) প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। আর অপর কোনও সমাজ, সাধনা ও সভ্যতা বা তার আর দুই তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ বক্ষে ফুটাইয়া অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। ভারতবর্ষও বিশ্ব-মানবের অঙ্গ, বিশ্ব-মানবের লীলাক্ষেত্র, বিশ্ব-মানবের লীলার সহায় ও সহচর। য়ুরোপও তাহাই। য়ুরোপ তাঁর এই বিশ্ব-ব্যাপী লীলা-নাট্যের দু'একটী অঙ্কের আপনার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের ও য়ুরোপের সত্যের এবং সাধনার আলোচনা করিবার সময় সর্ব্বদা এই কথাটা মনে করিয়া রাখা প্রয়োজন।

সামান্য-মনুষ্যধর্ম্ম

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। এই গুণ সামান্যই মনুষ্যত্বের সার্ব্বজনীন নিদর্শন। সকল মানুষেরই চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও নিয়ন্তারূপে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ মনোবৃত্তি আছে। আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় একটা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় বহির্জগৎও সকলের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। চিরদিনই মানুষ এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বহির্জগতে বিচরণ করিয়া আপনার জীবনের অশেষবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই মানুষ সর্ব্বত্র আপনার দর্শন ও বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয় সকল মোটের উপরে এক এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই রূপরসাদিপূর্ণ বহির্জগতও স্বল্পবিস্তর সমানধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা এবং সাধনা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে। একই সময়ের ও একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকেও একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম বাহির করিয়া লয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সাধনাও সেইরূপ মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিচার ও আলোচনা করিয়া, জীব ও জগত, জীব ও জগতের পরস্পরের সম্বন্ধ, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি ও পরিণতি, এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তকেই দর্শন কহে। এই সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষ আপনার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি ও জ্ঞান-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু একদিকে যেমন মানুষের একটা অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা আছে, অন্যদিকে সেইরূপ তার অনন্ত রসপিপাসা এবং কর্ম্ম-লিপ্সাও রহিয়াছে। কেবল জ্ঞানেতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। যাহাকে সে জ্ঞানেতে লাভ করিল, তাহাকে সে ভোগ করিতে চাহে; তার মধ্যে সে আনন্দ অন্বেষণ করে; তার সঙ্গে সে রসের সম্বন্ধ পাতাইতে যায়, তাহার দ্বারা তার ভাবেরও তৃপ্তি করিবার জন্য সে লালায়িত হয়। ফলতঃ জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই রস বা ভাব জাগে। ভাব জাগিলেই তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও সম্যক্ সার্থকতার জন্য সেই জ্ঞান ও ভাব উভয়ে মিলিয়া কর্ম্মের প্রেরণাকে জাগাইয়া দেয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম— Reason, Emotions, Will— এই তিন পদে মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই পূর্ণ হয়। জ্ঞানের পূর্ণতা অপূর্ণতা, ভাবের পরিপক্কতা বা অপরিপক্কতা, কর্ম্মের পটুতা বা অপটুতা,— এ সকল বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ থাকে বটে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান সেখানেই ভাব, যেইখানেই ভাব সেইখানেই কর্ম্ম-চেষ্টা,— অনায়ত্তকে আয়ত্ত, যাহা লোভনীয় অথচ আপাততঃ অলব্ধ, তাহাকে লাভ করিবার জন্য বহুবিধ উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোজন,— এসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্ম সাধন। যে পরম-তত্ত্ব ঐ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ভাবের আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিত্য সাধ্য বস্তু।

মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রভাব

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনা মানবীয় অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছে, মানব জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মানবসমাজের গঠন ও বিকাশের কতকগুলি বিশেষ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট সাধন অবলম্বন করিয়াছে। এইগুলি ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্ট ও নিজস্ব কর্ম্ম। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত, মধ্যআশিয়ার বিস্তৃত উপত্যকাভূমি হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ও মধ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতের এই সাধনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল এই বিশাল মানব সমাজ যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন, যে সমাজ-নীতির অনুসরণ, জীবনে যে আদর্শের সাধন করিয়াছে, তার গভীরতম মর্ম্ম এবং মূল সূত্রগুলি ভারতের তত্ত্ববিদ্যার, ভারতের সমাজনীতির এবং ভারতের ধর্ম্মনীতির ও ধর্ম্মসাধনের মধ্যেই কেবল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী রোমক্-শাসন-যন্ত্র, রোমক-রাষ্ট্র-তন্ত্র, এবং রোমক-ব্যবহার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া পৃথিবীতে একটা নূতন একতার ও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও দিন আশিয়াখণ্ডে এরূপ কোন পার্থিব সাম্রাজ্যের বা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই, বা করিতে চাহে নাই। কিন্তু রোম যেমন য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবহার-বিধি, এবং শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপে ভারতবর্ষও সমগ্র মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির এবং পারমার্থিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছে। পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি বা পার্থিব সম্পদ ও সাধনার প্রভাব অপেক্ষা যে পরিমাণে গভীরতর হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার উপরে রোমের প্রভাব

অপেক্ষা প্রাচ্য আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উপরে ভারতবর্ষের প্রভাবও সমধিক গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে আশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূভাগে, এই অগণ্য কোটি লোকপুঞ্জের মধ্যে, জাতি-বর্ণ-গত, আচার-অনুষ্ঠান- গত, অশেষ প্রকারের বৈষম্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এসকল ভেদবিরোধের মধ্য দিয়াই আমরা একটা বিশিষ্ট আকারের সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি আদর্শ এবং সাধন-পন্থাও দেখিতে পাই। আর ভারতের তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সমাজ-তন্ত্র, জীবনাদর্শ, ও ধর্ম্ম-কর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে। এক কথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের যন্ত্র ও সাধনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষ যে কেবল প্রাচ্য আশিয়ার সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও আধ্যাত্মজীবনকেই আপনার তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন-পন্থার দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহা নহে। যে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আশিয়া সত্যের সন্ধানে গিয়াছে, তার মূল উপাদান ও প্রণালী, তার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি বা scientific concepts, যে ভাবে আশিয়া এই প্রত্যক্ষ জগৎকে জানিতে ও ধরিতে গিয়াছে তার শ্রেণীবিভাগ, আর মানুষের সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের যে সকল সূত্র ও সন্ধান ধরিয়া আশিয়া সত্ত্বার বা সত্যংএর এবং চৈতন্যের বা জ্ঞানংএর মূল প্রকৃতির অনুসন্ধানে যাইয়া আপনার বিবিধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তৎসমুদায়ই ভারতের নিকট হইতে পাইয়াছে। জাপানের ও চীনের তর্কশাস্ত্র ভারতের ন্যায়ের মূল সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। য়ুরোপের ন্যায়দর্শন গ্রীশীয় ন্যায়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রীশীয়দিগের প্রমাণপ্রতিষ্ঠার প্রণালী ভারতের প্রমাণবিজ্ঞানের প্রণালী হইতে ভিন্ন। জাপানের ও চীনের প্রমাণ বিজ্ঞানে ভারতীয় ন্যায়েরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীশীয় ন্যায়ের নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা phioslophy of nature জড় ও গতির, কারণ ও কার্য্যের, দেশ ও কালের যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চীনের মধ্যযুগের বিজ্ঞান তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। হিন্দুর রাসায়ণজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই চীনে কোনও কোনও পণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। চীন নানা প্রকারের রঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছে, আর তার কতকগুলি হিন্দুর রাসায়ণবিদ্যার আশ্রয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞরা মধ্যযুগের চীনের এবং জাপানের ললিতকলাকেও ভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

দর্শনের উপাদান

ইহজীবনে আপনার শরীর মনের আশ্রয়ে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তার নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করতে যাইয়াই দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। অভিজ্ঞতা বলিতে এক জন জ্ঞাতা, এই জ্ঞাতার কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কতকগুলি শারীরিক যন্ত্র ও মানসিক বৃত্তির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষই জ্ঞাতা এবং প্রত্যেকেরই জ্ঞানলাভের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে। এই জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয় মোটের উপরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম, সে তার নিজকে জানে, আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা রূপে জানে, অতএব সে নিজে তার নিজের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। ২য়, সে এই বিশাল বিষয়-রাজ্যকে জানে, এই বহির্জগতের রূপরসাদি তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া তার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ৩য়, সে অপর মানুষকে এবং এই মানুষ যে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে তাহাকেও জানে। ঐ বহির্জগত বা বিষয় রাজ্য (আর এখানে আমাদের শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনোবৃত্তি সকল পর্য্যন্ত বিষয়পদবাচ্য হয়) এবং অপর মানুষ ও মনুষ্য-সমাজ— এই উভয়ই আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় ইদং পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়— সেই মানুষ অহং পদবাচ্য হয়। এই অহং ও এই ইদংকে লইয়া মানুষের যা কিছু লীলাখেলা। এই দুই তত্ত্বের আশ্রয়েই মানুষ তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি কোথায়, স্থিতি কিসে, গতি কোন্ দিকে, নিয়তি কি, ইহার প্রকৃতি ও প্রণালী, মূল্য ও মর্ম্ম কি, এসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়াই যাবতীয় দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের সাধনা এই মানবীয় অভিজ্ঞতার কি বিশেষ তত্ত্ব ও মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে? আমাদের দেশে এই বিশ্ব সমস্যার কিরূপ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে,— সকলের আগে আমি এই প্রশ্নেরই আলোচনা করিব। তারপরে হিন্দু এই বিশাল বিষয় রাজ্যকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে, মানুষ এবং মানবসমাজ সম্বন্ধেই বা হিন্দু কোন্ বিশেষ সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ক্রমে এসকল বিষয়েরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে এই শান্তিবাচন আছে,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"ওঁ তাহা (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (অর্থাৎ ঐ বীজের ব্যক্ত আকার) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই কেবল অবশিষ্ট থাকে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

হিন্দুরা কি ভাবে আপনার যাবতীয় অভিজ্ঞতার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই শান্তিবাচনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই।

"তদ্ধেনং তর্হ্যব্যাকৃত মাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তা-সৌনামাহমিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেহসৌনামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নোহি স প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃন্বন্ শ্রোত্রং মন্বানোমনস্তান্যস্যৈতানি

কর্ম্মনামান্যেব। সযোহত এৈকৈকমুপাস্তে ন স বেদ অকৃৎস্নোহ্যেষোহত এৈকেকেন ভবতি আত্মেত্যেবোপাসীতা এহ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মাহনেন হ্যেতং সর্ব্বং বেদ। যথাহবৈপদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবংবেদ।"

''তখন সেই অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ব্রহ্মই কেবল ছিলেন। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুই নামরূপের দ্বারা ব্যক্ত হইলেন। এই জন্য এখনও লোকে নাম ও রূপের দ্বারাই সমুদায় পদার্থকে বিশিষ্ট করিয়া থাকে— বলে ''ইহার এই নাম", ''উহার এই আকার"।

''সেই ব্রহ্ম এই ব্যক্ত ও নামরূপের দ্বারা বিশিষ্টকৃত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। নখাগ্রভাগ পর্যন্ত সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষুর যেমন আপনার আধানে নিঃশেষে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ হইলেন। অথবা সকল বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে যে বায়ুমণ্ডল, তাহা যেমন আপনার মণ্ডলস্থিত সকল জীবের অন্তর্বাহ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই ব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

''কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সকলের অন্তরতর ও অন্তরতম বস্তু, তথাপি অল্পবুদ্ধি লোকে তাঁহাকে দেখে না। তাঁহাদের নিকট তিনি অকৃৎস্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন। তাঁর অনুপ্রাণনেই জীবের প্রাণল ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই জন্য ইহারা তাঁহাকে প্রাণ নামে অভিহিত করে। তাঁহারই প্রেরণায় জীবের বাণী উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা তাঁহাকে বাক্ বলে। সেইরূপ শ্রবণ জন্য তাঁহাকে শ্রোত্র, দর্শন জন্য তাঁহাকে চক্ষু, মনন জন্য তাঁহাকে মন বলে। কিন্তু এ সকল তাঁর কর্ম্মেরই নাম মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্রাদির নাম ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব যাহারা তাঁহাকে প্রাণাদিরূপে ভজনা করে, তাহারা সমগ্র তত্ত্বের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই অপূর্ণজ্ঞাননিবন্ধন তারা সচ্চিদানন্দ পুরুষের সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

''এই আত্মাতেই তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বিরাজিত; জ্ঞান, আনন্দ, প্রাণ, সকলই এই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাতেই এ সকল বহুবিধ নামরূপ এক হইয়া আছে। ''ঐ" আর ''এই" সকলই আত্মা। ''তাহা" ও ''ইহা" সকলই আত্মা। যাঁহাকে আত্মা কহে এ সকল তাঁহারই বিবিধ জ্ঞানবলক্রিয়া। আত্মাই এ সকলের বীজ ও আশ্রয়। এই আত্মার উপাসনার দ্বারাই সকল জ্ঞান লাভ হয়। যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে আপনার ঈপ্সিত লাভ করে, সেইরূপ এই আত্মাকে যে জ্ঞাত হয় সে কীর্ত্তি এবং পরমানন্দ ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

''এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে ''আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল আত্মা মাত্র ছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন আর কেহও কিছু নাই, তখন তিনি ''অহং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন— এই সকল বলিয়া এবং এই পরমাত্মই একমাত্র উপাস্য, অপর দেবতা উপাস্য নহেন, এই উপদেশ করিয়া, শ্রুতি এখন, এই পঞ্চম ব্রাহ্মণে, এই আত্মা হইতে কিরূপে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনন্ত এবং তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ। এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী পরিপূর্ণ ঈশ্বর আংশিক বা অপূর্ণ ভাবে কোনও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন না। এইরূপ কল্পনা তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বেরই বিরোধী। তিনি যেখানেই থাকেন, পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। অতএব অগ্নি, বায়ু প্রবৃথি দেবতাতে তিনি পরিপূর্ণ রূপেই বিরাজ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে ঈশ্বর রূপে ভজনা করা সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রুতি কহিয়াছেন, ''যে ব্যক্তি পরম পুরুষকে অগ্নি কিম্বা বায়ুরূপে ভজনা করে, তার উপাসনা অপূর্ণ হয়; কারণ এ সকল তাঁর ক্রিয়া বিশেষের বা গুণবিশেষের প্রকাশ মাত্র, তাঁর সর্ব্বগুণ প্রকাশ করে না। পরমপুরুষ পরমেশ্বর যখন আত্মরূপে উপাসিত হন, তখনই কেবল তাঁর পূর্ণ উপাসনা হয়। এই আত্মা যা ''অহং''ই জ্ঞানের ও চৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই জন্যই পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে বা ''অহং" রূপে উপাসিত হন, তখনই তাঁর সত্য উপাসনা হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মা বা অহং শব্দ পূর্ণতা জ্ঞাপক। জীব শরীরের আর কোনও চেষ্টা এই অহং প্রত্যয়ের পূর্ণতার সমকক্ষ হইতে পারে না। প্রাণন, শ্রবণ, দর্শনাদি মানুষের ক্রিয়া বিশেষের বিভিন্ন অংশ মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সে অহং বলে, তখন তার মধ্যে এই সমূদয়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া এবং তার অতিরিক্ত আরও অনেক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে। অতএব পরমপুরুষের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এই অহং নামে বা শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ব্যক্তি করিয়া থাকে।"

উপরে মূল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মাধ্বভায্যের মর্ম্ম বাঙ্গলা করিয়া দিলাম। আমার বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই প্রাচীন ঋষিবাক্যে আমরা তিনটী বিশেষ তথ্য প্রাপ্ত হই;—

১ম,— একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতি, আর আত্মাই এই পূর্ণতত্ত্ব।
২য়,— আমরা যাহাকে ''আমি" ''আমি" বলি সেই অস্মদ প্রত্যয়ের বস্তুই আত্মবস্তু, আর এই আত্মবস্তুই বিশ্বের পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণতত্ত্ব

যাহাতে এই বিশ্ব সমস্যার নির্ব্বিরোধ মীমাংসা হয়, তাহাকেই আমাদের দর্শনের পরিভাষায় তত্ত্ব কহে। এই ঋষি বাক্যেতে আমরা এই পূর্ণতত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের একটা গভীর অনুভূতির প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বের বস্তু বা বিষয় অশেষ; চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এক নহে। ইহারা প্রত্যেকেই জাগতিক বস্তু সকলের এক একটী গুণ বা ধর্ম্মকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকে। চক্ষু বস্তুর রূপ, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, এইরূপে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের নিকটে উপস্থিত করে। এখানে একত্বানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি কহিতেছেন, আপাততঃ যাহা বহুরূপে প্রতীত হইতেছে, মূলে তাহা বহু নহে। যাহা খণ্ড খণ্ড বলিয়া দেখা যাইতেছে, মূলে তাহা অখণ্ড। যাহা অপূর্ণ বোধ হইতেছে তাহা পূর্ণ। ব্রহ্মই সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই পূর্ণ বস্তু বা পূর্ণ তত্ত্ব। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সেই পূর্ণবস্তুরই বিবিধ

ও বহুমুখী প্রকাশ মাত্র। এই জন্য ইহারা ব্রহ্মেরই নিদর্শন। সেই ব্রহ্মকে, সেই পূর্ণতত্ত্বকেই ইহারা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে, কেবল মাত্র আংশিক বা খণ্ডবস্তুকে প্রকাশ করে না।

আত্মাই পূর্ণতত্ত্ব

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের এই সকল ইন্দ্রিয় যে ব্রহ্মের আংশিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি মাত্র প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রহ্মের অখণ্ড পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই আত্মার দ্বারাই ''সূত্রে মণিগণা ইব''— হারের মণি সকল যেমন তার সূত্রেতে গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাদের দর্শনশ্রবনাদি নানাবিধ খণ্ডজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া জ্ঞানের বা অনুভূতির একত্ব প্রতষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখি, কর্ণের দ্বারা গন্ধ শুঁকি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শলাভ করি; এ সকলই খণ্ডজ্ঞান। রূপ ও শব্দ, শব্দ ও স্পর্শ, স্পর্শ ও গন্ধ, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিভিন্ন অনুভূতির বিষয়; আর এই সকল বিভিন্ন অনুভূতি কখনও একই কালেও জন্মিতে পারে না। প্রবল স্রোতবাহী জলপ্রবাহের, কিম্বা প্রবল ব্যাতামুখে বায়ুপ্রবাহের ন্যায় এ সকল অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে ইন্দ্রিয়ের ও মনের উপর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে। চক্ষু রূপই দেখে, কিন্তু এই রূপও অখণ্ড বস্তু নহে। রামের রূপ প্রথমে তার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহারে গঠিত; তার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে যে বর্ণের আভা ফুটিয়াছে, তাহা বিন্দু বিন্দু বর্ণের সম্মিলনে রচিত। রূপ বস্তুও অখণ্ড নহে। চক্ষু কোন রূপই একেবারে ও একই সঙ্গে সমগ্রভাবে দেখিতে পায় না। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চক্ষু দেখে, কিন্তু এই খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া আত্মা বস্তুর রূপের জ্ঞান ফুটাইয়া তুলে। শব্দজ্ঞানও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সংযোগে ও সমাহারে উৎপন্ন হয়। আর আত্মাই আমাদের সকল অভিজ্ঞতার নিত্য সাক্ষী হইয়া এ সকলকে সম্ভব ও সার্থক করিতেছেন। এই আত্মার অন্বেষণ, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ও যে আত্মজ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দ বস্তু। ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মাকে জানিলে আর অপর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুর দর্শন চিরদিনই এই একত্বের অন্বেষণ করিয়াছে। এই একত্বানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই সহজ বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দু সর্ব্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্যই বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই প্রেরণাতেই হিন্দু বলিয়াছে— ''যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি'' অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই। আর এই ভূমাকে হিন্দু কেবল জ্ঞানের অজ্ঞেয় ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। এই ভূমাই সমুদায় জ্ঞানের ও সমুদায় সত্তার আধার অস্তিত্ব মাত্র অনুভব করিয়াই হিন্দু ক্ষান্ত হয় নাই। সকল দেশের সকল তত্ত্ববিদ্যা এবং তত্ত্বমীমাংসাই কোন না কোনও আকারে এই অনন্তকে বা ভূমাকে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দু কেবল অনন্তকে এই ভাবে মানিয়া লইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহুবিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছে, এবং অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই ভূমাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' রূপে আপনার আত্মার মধ্যে এই আত্মার নিত্য সিদ্ধ একত্বের মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই নিগূঢ় একত্বানুভূতিই হিন্দুর নিকটে সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে, বাস্তবের মধ্যে জ্ঞাতব্য, তাহাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত এই সহজ প্রকৃতিসিদ্ধ একত্বানুভূতিই তাহার সমুদায় জ্ঞানান্বেষণ ও কর্ম্মচেষ্টার প্রেরয়িতা হইয়া হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূল সূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে,—

"The Hindu not only starts from Experience as homogenous whole, but always in investigating the manyfold in the real world, returns to the actual synthetic unity in the *Atma.*"

বারান্তরে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

উৎস : নারায়ণ, অগ্রহায়ণ, ১৩২১, পৃ. ৭১-৮৫।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

 Low Cost readymade Latrine (Toilet) Low Cost House Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহৎ জীবন—বৃহৎ কর্ম

অর্ণব নাগ

উনিশ শতককে আমরা কেন মনে রাখব, আজ এই প্রশ্ন ওঠাটা অসমীচীন নয়। বিবিধ কারণ তো থাকতেই পারে, তবে মুখ্য কারণ উনিশ শতকের ধর্মান্দোলন। ধর্ম আর সমাজ-সংস্কার যে এভাবে মিলেমিশে যেতে পারে চিরন্তন ধর্মীয় ঐতিহ্যশালী ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেনি। পাণ্ডব-বর্জিত বঙ্গদেশ তো নয়ই। রাজা রামমোহনের জন্ম আঠোরো শতকের শেষদিকে হলেও তাঁর কর্মজীবনের প্রধান সময় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই। এরপর একে একে এসেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে শেষে রবীন্দ্রনাথ (যাঁকে ইদানীং নানান আঙ্গিকে দেখার প্রয়াস হলেও, তাঁর দার্শনিক উপলব্ধি যে বহু খ্যাতনামা-অনামাদের ধর্মজীবনের পাথেয় হয়েছে তার স্বীকৃতি দুর্ভাগ্যবশত এই আঙ্গিকগুলির মধ্যে নেই), বিবেকানন্দে তার একপ্রকার সমাপ্তি হয়েছে। মাঝে অবশ্য রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্বামী প্রণবানন্দের মতো কত অজস্র মনীষী যে ধর্মজীবনের দিশা দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বঙ্গে সৃষ্ট আলোকবিন্দু ক্রমে ব্যাপ্ত করল গোটা ভারতবর্ষকেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪— ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৮) মহৎ জীবন ও বৃহৎ কর্মপ্রয়াসকে অনুধাবন করার চেষ্টা হতে পারে। কারণ এই ধর্মান্দোলনকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার খানিক সুবিধে তাঁর ছিল এবং পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত জ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের ছাঁচে ঢালাই করার কাজটি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সে যুগের অজস্র মণিমাণিক্যের সন্ধান যে তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা আজ অবশ্য স্বীকার্য। যদিও নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে উত্তরকালের বিবেকানন্দের থেকে তিনি ছিলেন বছর খানেকের ছোটো কিন্তু জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনে নরেন দত্তের ওপরের শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের মতোই তিনি কলেজে পেয়েছিলেন বৃটিশ দার্শনিক কবি উইলিয়ম হেস্টিকে। যে হেস্টি সাহেবের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-সমাধির কথা সর্বপ্রথম শুনেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সুতরাং রামকৃষ্ণের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের ছিল সহজাত আকর্ষণ বোধ। সেই আকর্ষণ থেকে একদিন ছুটেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে ‘বিবেকানন্দের গুরু’কে দর্শন করতে। তারপর অসাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজের দার্শনিক অভিজ্ঞতাকে : ‘আমার মতো গৃহগুহাশ্রয়ী মানুষকে অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে বিবেকানন্দের গুরুকে দেখবার অ্যাডভেঞ্চার করতে বাধ্য করাল। সেখানে মন্দির উদ্যানের শান্তিময় আশ্রয়ে এক সুদীর্ঘ গ্রীষ্মদিবসের প্রায় সমস্তক্ষণ কাটাবার পরে সূর্যাস্তকালে দৃষ্টিভ্রান্তিকর গর্জনশীল, ঝঞ্ঝাবায়ু ও বজ্রপাতের মধ্যে যখন আমি প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমি দৈহিক ও নৈতিক সত্য সম্বন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছি, আমার মনে তখন এই অস্পষ্ট সত্যবোধ জেগেছে যে, আপাতভাবে বিশৃঙ্খল উদ্ভট বস্তুকেও বিশ্বনিয়ম নিয়ন্ত্রিত করছে; যেটাকে বাইরে থেকে নিছক আত্ম-উৎসাদন বলে মনে হয়, সেটা আত্মআধিপত্যও হতে পারে, ইন্দ্রিয় তার ভ্রান্তি সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ হেতু ছাড়া কিছু নয় এবং বাইরের ত্রাণশক্তির উপর বিশ্বাস আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌল কর্মের অস্পষ্ট প্রতিভাস।’
(অনুদিত)।

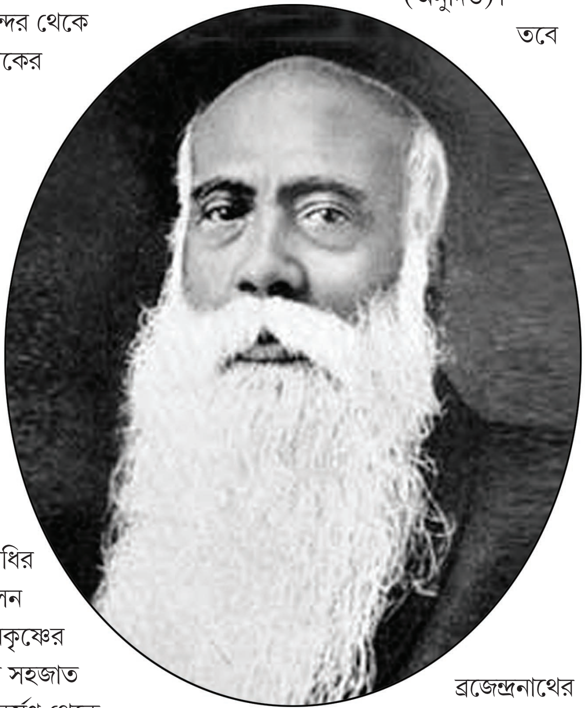

তবে ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তার। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের অবিসংবাদিত প্রভাবও ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর ধর্ম দর্শনের খোরাক মূলত এদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে রামকৃষ্ণের ধর্ম-চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা যে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথকে মননশীলতার দিক দিয়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিল তা বোঝা যায় তাঁর জীবনের অন্তিমপ্রান্তে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মমহাসভায়

১৯৩৭ সালের ১ মার্চ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি অসুস্থতাবশত তাঁর এক ছাত্রের মাধ্যমে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে সর্বজনীন ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন, কেশব সেন ও রামকৃষ্ণের ধর্মাদশের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

হুগলী জেলার হরিপালে জন্ম হয় তাঁর। বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মহেন্দ্রনাথ শীল। অল্প বয়সেই হারিয়েছিলেন বাবা এবং মা-কেও। ফলে শৈশব কেটেছিল একপ্রকার দারিদ্র্যের মধ্যে মামা রাধারমণ নানের আশ্রয়ে। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বিএ উত্তীর্ণ হয়ে ওই কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেন্টাল অ্যান্ড মরাল ফিলজফি-তে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলেন অসাধারণ। শুধুমাত্র ডিগ্রিগত যোগ্যতাতেই তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক দশটি ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। কর্মজীবনে শিক্ষক হিসেবে নানান গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। যেমন কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ), নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৮৫-৮৭ খৃষ্টাব্দ), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৮৭-৯৭ খৃষ্টাব্দ), কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৭-১৯১২ খৃষ্টাব্দ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক (১৯১২-১৯২১ খৃষ্টাব্দ) এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (১৯২১-৩০ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত পদে আসীন ছিলেন তিনি।

কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানের পদে তাঁর কর্মসুকৃতী তাঁকে আচার্যের মর্যাদা দিয়েছিল কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ছিলেন 'চলমান বিশ্ববিদ্যালয়', তাঁর রচিত গ্রন্থরাশির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তা মালুম হয়। তিনি মূলত ইংরেজি ভাষাতেই তাঁর দর্শন-চর্চা করেছেন। বাংলাতে এধরনের প্রজন্মের সংখ্যা হাতে গোণা। তাঁর একটি বাংলা রচনা 'হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব' আমরা উদ্ধার করলাম 'স্বস্তিকা'র পাতায়। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা'র ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। রচনাটির সংক্ষেপিত পুনর্মুদ্রণ হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় (দ্রঃ 'কষ্টিপাথর', পৌষ, ১৩২১)। সুখের কথা তপন কুমার ঘোষ 'ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাংলা রচনা' (পত্রলেখা, ২০১৩)-গুলিকে একমলাটের মধ্যে নিয়ে আসার প্রয়াস নিয়েছেন।

তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ সমূহের কয়েকটি দিকে এবার তাকানো যাক। —'A Memoir on the co-efficient of Numbers– A Chapter on the Theory of Numbers' (1891); 'Neo-Romantic Movement in Bengali Literature' (1890-91), 'A Comparative Study of Christianity and Vaisnavism' (1899), 'New Essays in Criticism' (1903), 'Introduction to Hindu Chemistry', 1911), 'Positive Sciences of the Ancient Hindus (1918), Race-Origin' (paper read at the Universal Races Congress, London, 1911), 'Syllabus of Indian Philosophy' (1924), 'Rammohan, the Universal Man' (1933), 'The Quest Eternal' (a philosophical poem, 1936), 'Autobiography' (unpublished MSS.), 'Positive Background of Hindu Sociology' (with B.R. Sarkar) ইত্যাদি। (ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের এই গ্রন্থতালিকা 'ভারতকোষ', পঞ্চম খণ্ড থেকে গৃহীত)।

দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্যই অগ্রণী পথিকৃৎ। যেমন, তুলনামূলক সাহিত্য বিচারে ও ধর্ম-দর্শন তত্ত্বালোচনায় এবং দর্শনতত্ত্বে গাণিতিক সূত্র প্রয়োগে ভারতবর্ষে তিনিই পথদ্রষ্টা। আর এ কাজের স্বীকৃতিতেই ডক্টরেট ছাড়াও লাভ করেছিলেন ডি এস সি (১৯১৫ খৃষ্টাব্দ), বৃটিশ রাজোপাধি নাইট (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ), মহীশূরের 'রাজরত্নপ্রবীণ' (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ)। বেশ কয়েকবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। রোমের ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) এবং লন্ডনের বিশ্ব জাতি কংগ্রেসে (১৯১১ খৃষ্টাব্দ) তাঁর অভিভাষণ জগৎসভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান নেওয়ার দিক্‌চিহ্নস্বরূপ। তাঁর হিন্দুদর্শন ও ভারত-ভাবনা বিশ্বমানবধর্মের গণ্ডিতে পর্যবসিত হয় ওই বিশ্ব সম্মেলনগুলিতে। হেগেল ও হার্বার্ট স্পেনসারের মতবাদের বিচ্যুতি তিনি দেখান এবং 'হিস্টরিক্যাল মেথডের যৌক্তিকতা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠানলগ্নে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সভাপতিত্ব করেন তিনি। তাঁর ৭২তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে

সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে

গূঢ় হতে উদ্বারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে।'

(প্রবাসী, মাঘ,১৩৪২)

তবে তাঁর সরস্বতী সাধনার সবচেয়ে বড়ো শংসাপত্রটি ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রয়াণের পরে পান 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে : 'অবস্থাচক্রে ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা ও প্রতিভার অনুরূপ গ্রন্থাবলী তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যেমন বড় ব্যাঙ্কের সাহায্যে বণিকেরা ও ছোট ছোট ব্যাঙ্ক নিজ নিজ কারবার চালায়, তেমনই অনেকে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রতিভার আনুকূল্যে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক কারবার চালাইয়াছেন।' ('প্রবাসী', পৌষ, ১৩৪২)।

অকালে জীবনদীপ নির্বাপিত হলেও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জ্ঞান-শিখা কোনোদিন নিভল না। জন্মের সার্ধশত প্রস্তরফলক পেরিয়েও তা অমলিন ও সমান প্রাসঙ্গিক। ▮

চিঠিপত্র

সলমনের জামিন এবং কিছু প্রশ্ন

মদ্যপ অবস্থায় এবং লাইসেন্স ছাড়াই মুম্বইয়ের রাস্তায় গভীর রাতে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে ফুটপাথে ঘুমন্ত চার ব্যক্তিকে চাপা দেওয়া এবং তাঁদের একজনকে অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে মুম্বইয়ের এক নিম্ন (দায়রা) আদালত বলিউডের বিখ্যাত ফিল্ম স্টার সলমন খান (সল্লু মিঞা)-কে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ৮ মে। কিন্তু নাটকীয়ভাবে এদিনই সন্ধ্যায় তিনি অন্তবর্তী জামিন পেয়ে যান মুম্বই হাইকোর্ট থেকে। এই জামিনকে কেন্দ্র করে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে হাইকোর্টের আচরণে। তাঁদের প্রশ্ন, সলমনের জামিন মঞ্জুরে হাইকোর্ট এত উৎসাহ ও অতি-সক্রিয়তা দেখাল কেন? কেন নজিরবিহীনভাবে নিম্ন আদালতের রায়ের কপি না দেখেই এবং শুধুমাত্র সলমনের আইনজীবীর বক্তব্যে হাইকোর্ট সন্তুষ্ট হয়েই সলমনের জামিন মঞ্জুর করল?

ভারতের আইন, আদালত ও বিচারব্যবস্থার উপর আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধা রয়েছে। তবু কোনো কোনো রায়কে অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। তাছাড়া সব বিচারকের বিচার যে একই হবে তাও নয়। যদি তা হত, তাহলে নিম্ন আদালতে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ আদালতে তিনি বেকসুর খালাস পান কী করে? অথবা নিম্ন আদালতে কোনো ব্যক্তি নিরপরাধ প্রমাণিত হয়েও উচ্চ আদালতে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন কিরূপে? লালু প্রসাদ যাদব আদালতের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামি। তাঁর জেল হয়েছে। জেলেই তাঁর থাকার কথা। কিন্তু তিনি উর্ধ্বতন আদালত থেকে জামিন নিয়ে দিব্যি বাইরে রয়েছেন। রাজনীতিও করছেন প্রকাশ্যে। তাই অধিকাংশ মানুষের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে আইন, আদালত ও বিচার ধনীদের জন্য। সলমন কোটিপতি। তাই তিনি বিচারের শেষ দেখে ছাড়বেন। মুক্তিও পেতে পারেন বা জেলযাত্রা বহালও থাকতে পারে শীর্ষ আদালতের রায়ে। অবশ্য ওই আদালত পর্যন্ত মামলা গড়ালে তবেই।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ধর্মঘট ও সরকারি বেতনভোগীরা

'নির্বাচন পরবর্তী ধর্মঘট রুখতে শাসকদল ও প্রশাসনের যৌথ সন্ত্রাস' দেবব্রত ঘোষ মহাশয়ের সংবাদ প্রতিবেদন (স্বস্তিকা ১১ মে সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা। গত ৩০ এপ্রিল সিপিএম বিজেপি ও কংগ্রেসের সমর্থনে ডাকা ১২ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য শাসকদল যে চরম নৈরাজ্যপূর্ণ অত্যাচার চালালো তা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী। সেই দল গণতন্ত্রের আশ্রয়ে থেকে, গণতন্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ করে চলেছে। 'রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বললেন আমরা মাইনে দিই, কাজেই স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের কর্মস্থলে আসতে বাধ্য'। এই 'বাধ্য' অধ্যাদেশে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নগুলি উঠে আসছে—

প্রথমত, জনগণও একইভাবে বলতে পারে 'আমরাও তো তাদের যাবতীয় ভাতা-সুযোগসুবিধার নামে সরকারি কর্মীদের বেতন দিই, আমাদেরই কষ্টার্জিত টাকা, সম্পত্তির কর এবং জাতীয় সম্পদ থেকে। আমাদেরই দেওয়া ক্ষমতায় তারা বলীয়ান হয়েছে।' দ্বিতীয়ত, ধর্মঘটের দিন রাস্তায় হাঙ্গামা, গণ্ডগোলের কারণে কোনো কর্মী তার জীবনের ঝুঁকি নিতেই বা যাবে কেন, তার জন্য তার একটি ছুটি সে পাবে না কেন? বাড়িতে তার আপনজনেরা সারাদিন বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত রক্তচাপবর্ধক উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগের মধ্যে থাকবে কেন? এই সমস্ত প্রশ্নে আদালত সরকারি কর্মীদের পক্ষেই রায় দেবে। তৃতীয়ত, ধর্মঘট যারা ডেকেছিল তাকে বা তাদের শাস্তি না দিয়ে সামান্য সরকারের সেবকদের শাস্তি দেবে কোন্ অধিকারে? আদালত এখানেও তার পক্ষেই রায় দেবে? চতুর্থত, ধর্মঘট ডাকার তো কথা ছিল না। কার পাপে ধর্মঘট ডাকা হলো? সরকারি কর্মীদের পাপে? যারা ধর্মঘট ডাকলো তাদের পাপে? —আমিই অন্যায় করবো, আবার আমিই আর একজনকে অন্যায় শাস্তি দেব— এটা কোন্ সভ্যদেশের নমুনা বহন করে? পঞ্চমত, সরকার নাকি ধর্মঘটের হাঙ্গামায় ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিত— কারুর পুত্র বা কারুর স্বামী হাঙ্গামায় নিহত হলে দু' লক্ষ টাকা দিত; —ব্যাস, অমনি সব মিটে যেত? কেউ যদি দাবি করে 'আমার টাকা চাই না, আমার পুত্র বা আমার স্বামীকে জীবিত সুস্থ ফিরিয়ে দিতে হবে, তাহলে কোন্ ঔদ্ধত্যের ওষুধে তাকে জীবিত সুস্থ ফিরিয়ে দিতে পারতেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়? কারুর ২৫ বছর চাকরি অবশিষ্ট আছে। সে রোজগার করবে কমপক্ষে এক কোটি টাকা। তার ক্ষতিপূরণের কী ব্যবস্থা? বিরোধী দল শক্তিশালী হলে ব্যাপক গণ্ডগোল অবশ্যম্ভাবী ছিল।

ষষ্ঠত, কমিউনিস্ট দলগুলি যে এত চিল্লামিল্লি করছে গলা ফাটিয়ে, তাদের তো মুখ খুলতেই লজ্জা করা উচিত। বাংলার উর্বর সুফলা সোনার জমি যে পদ্ধতিতে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে সেই পদ্ধতিতেই বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ফসল ফলাচ্ছে।

একথাও ঠিক কমিউনিস্ট দল আবার ক্ষমতায় ফিরলে তারা এর পর স্ট্যালিন-ড্রাইভারের রোলার চালাবে অকমিউনিস্টদের উপর; আরো ভয়ঙ্কর দিন দেখবে সেদিন রাজ্যবাসী। বাঙালির ভুলে যাওয়ার রোগ আছে; ভুলে গেলে রক্ষা নেই রাজ্যবাসীর। সাবধান!

—শ্রী ভীতুশ্রী কলমকথক।

হিন্দুত্বই ভারতের পরিচিতি

হিন্দু একটি সংস্কৃতি এবং এদেশের পরিচিতি। হিন্দু শব্দটি কখনই একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝায় না। ভারতবর্ষের আরেক নাম হিন্দুস্তান। সেই অর্থে সমস্ত ভারতীয়ই হিন্দু। সুতরাং হিন্দুকে শুধু ধর্মবাচক শব্দ হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। হিন্দু বা হিন্দুত্ব হল সংস্কৃতিসূচক বা রাষ্ট্রীয়তাসূচক শব্দ। ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক ধর্মমতে অর্থাৎ উপাসনা পদ্ধতির দিক থেকে মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, শৈব হলেও সবারই সংস্কৃতি বা রাষ্ট্রীয়তা হলো হিন্দুত্ব।

হিন্দুরা কোনো কালেই একটি উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেনি এবং কাউকে জোর করে একটি উপাসনা পদ্ধতিতে আনবার তীব্র বিরোধী। হিন্দুত্ব হল হাজার হাজার বছরের উত্থান-পতন, পরিবর্তন- পরিবর্ধনের দ্বারা বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ, এক জাতি, এক সুমহান সংস্কৃতি। হিন্দু বা হিন্দুত্বের মধ্যে সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই। যারা হিন্দুত্বের কথা শুনলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা বলে, বিরোধিতা করতে থাকে, তাদের হিন্দুত্ব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব। স্বামীজী বলেছেন—

'I am proud to call myself a Hindu, through grace of Lord, may you my country men, have the same pride may that faith in your ancestors came into your blood, may it become a part and parcel of your lives, may it work, towards the salvation of the world.'

হিন্দুত্বের মধ্যেই আছে মানবজাতির ঐকতানের সঙ্গীত। হিন্দুকে ধর্ম অর্থে ধরলেও এর বিশালতার মধ্যে সমগ্র মানবসমাজ আসতে পারে। অক্সফোর্ড অভিধানে ধর্ম বা রিলিজিয়ানের অর্থ—The eternal law of the Universe, particular system of faith and worship.

সেই অর্থে ভারতে বসবাসকারী মুসলমান বা খৃষ্টান হয়েও সে হিন্দুত্বের মূল্যবোধে বা সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হতেই পারেন এবং এটাই স্বাভাবিক। কেননা এটাই ভারতবর্ষের একমাত্র সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মহম্মদ করিম চাগলার একটি উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন যে, আমি ধর্মমতে (রিলিজিয়ন) মুসলমান, কিন্তু সংস্কৃতিতে হিন্দু। মহম্মদ ইকবালের বিখ্যাত গীত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা।' হিন্দুকে সংস্কৃতি হিসাবে মেনেই তিনি লিখেছিলেন। এ নিয়ে কোনো সমালোচনা হয়েছে বলে শোনা যায় না।

সেকুলারবাদীরা মানুন বা নাই মানুন এটাই সত্য যে মূল ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে বেদ, বেদান্ত থেকে উদ্ভূত সুমহান হিন্দু সংস্কৃতিকেই বোঝায়। হিন্দু সংস্কৃতিই ভারতের একমাত্র সংস্কৃতি যা সনাতন। সেকুলারবাদীরা যদি হিন্দু হিসাবে গর্বিত না হন তো বলার কিছু নেই। তাঁরা কিন্তু হিন্দু, কেননা ভারতে বসবাসকারী সবাই হিন্দু।

—**সমরকুমার বসু,**
চাকদহ, নদীয়া।

ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও ঘরবাপসী

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন এক সংস্কৃতি। প্রাচীন ভারতের সমস্ত মানুষই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এরপর ভারতবর্ষে বিদেশি শক্তির আক্রমণ শুরু হয়। বিদেশি শক্তি ভারতের সিংহাসন দখল করে এবং শুরু হয় তাদের রাজত্বকাল।

বিদেশি শক্তি উপলব্ধি করেছিল যে ভারতবর্ষে তাদের সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে হলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা দরকার। তাই শুরু হয় বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা। এই ভাবে ভারতবর্ষে হিন্দুদের অনুপাত কমতে শুরু করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে কিছু এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। তারপর যে সমস্ত এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পরে সেই সমস্ত অঞ্চল আলাদা দেশরূপে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আফগানিস্থানও এক সময় ভারতের অন্তর্গত ছিল যা আজ ভারত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ১৯৪৭ সালে সব থেকে বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটে। ভারতমাতা খণ্ডিত হয় ও তৈরি হয় পাকিস্তান। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'জনগণমন'-তে উল্লিখিত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বঙ্গ আজ খণ্ডিত।

স্বাধীনতার পরেও ভারতে ধর্মান্তকরণ বন্ধ হয়নি। সেবার আড়ালে প্রতিনিয়ত চলছে ধর্মান্তকরণ। আজ পূর্ব ভারতের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সেখানে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত খুবই কম হয়ে গিয়েছে। কে বলতে পারে ১৯৪৭ এর বেদনা ভোলার আগেই আবার একই বেদনার সাক্ষী আমাদের হতে হবে না? পূর্বভারত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না?

ভগবান নিজে বলে গিয়েছেন 'স্বঃধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'। তাই ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে আজ সময় এসেছে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তাই প্রত্যেকে যেন স্বাধীনভাবে নিজের ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে তা দেখা অবশ্যই সরকারের কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্মে ফিরে আসে তাতে আপত্তি কোথায়? একথা আমরা অনেকেই জানি যে মতিলাল নেহরুর এক কন্যা স্বরূপ হুসেন নামে এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনা মতিলাল নেহরুর কাছে ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি স্বরূপকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন এবং নাম রাখেন বিজয়-লক্ষ্মী। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় তাঁরাও ঘরবাপসীর সমর্থক ছিলেন।

তাই আজকের পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখতে প্রত্যেকেরই দল মত নির্বিশেষে স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন বা স্বেচ্ছায় ঘরবাপসীকে সমর্থন করা উচিত।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

পরম্পরা

শতাব্দীবর্ষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

অরুণকুমার সিংহ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে ইংরেজিতে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি বা বি এইচ ইউ বলা হয়। বর্তমানে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের শতাব্দী বর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। মহামতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বসন্ত পঞ্চমীর দিন এটি স্থাপন করেন। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১০ সালের মে মাসে ইন্ডিয়া টুডে-নিলসন সমীক্ষা ভারতের দশটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠতম বলে জানিয়েছে। ১৩৬০ একর জমির ওপর বিস্তৃত এই বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দূরদৃষ্টি ও বাস্তুশাস্ত্রের অভিরুচির সজীব প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানচিত্র শুক্লা অষ্টমী তিথির চাঁদের মতো, যা সব দিক থেকে সমান। ভবন তৈরির সময় এক একটি ইট ভেবেচিন্তে বিশেষ প্রয়োজনে গাঁথা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ইটে হিন্দিতে 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' লেখা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় এতই সুন্দর যে, যিনি প্রাচীন নালন্দা অথবা তক্ষশীলা বিষয়ে পড়েছেন বা শুনেছেন তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তার খানিকটা অনুমান করতে পারবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে, এখানে নার্সারি থেকে শুরু করে ডক্টরেট পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করা যায়। পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নেই এখানে পড়ানো হয় না। এখানে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধন করা হয়েছে। এই মেলবন্ধনকে বিশ্ববিদ্যালয়- গীত রচয়িতা অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

'মধুর মনোহর অতীব সুন্দর, সর্ববিদ্যার রাজধানী,
প্রতীচী-প্রাচী'র মেলবন্ধন, এ সর্ববিদ্যার রাজধানী।'

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সংস্কৃতি, ধর্ম, দেশ, ভাষা সব কিছুতেই পারদর্শী করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি আধুনিক শিক্ষার ভারতীয়করণ করে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল ও কৃষি বিভাগ রাখার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষা ও ধর্মবিজ্ঞান শাখারও পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রেখেছেন। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের মধ্যেও নিজস্ব ধারার এই অপূর্ব শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সময়োপযোগী করে আধুনিক বিশ্বের সামনে রাখা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে পণ্ডিতজীর বিশাল মূর্তি বসানো রয়েছে। মনে হবে, তিনি আগন্তুকদের মূল দরজায় স্বাগত জানাচ্ছেন। সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেই বাঁদিকে মহিলা মহাবিদ্যালয় চোখে পড়বে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে 'এমস্' নামে বিখ্যাত 'স্যার সুন্দরলাল চিকিৎসালয়'। এখানে প্রতিদিন নামমাত্র খরচে হাজার হাজার রোগীর সেবা করা হয়। আধুনিক কালের আবশ্যকতা অনুভব করে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষপ্রান্তে 'ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজি' পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বপ্নকে সদা জাগ্রত রেখেছে।

এই অপূর্বসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার জন্য পণ্ডিতজী কার কাছে না ঝুলি নিয়ে গিয়েছিলেন! কাশী নরেশের কাছ থেকে জমি দানস্বরূপ নিয়েছেন। দ্বারভাঙা নরেশ-সহ প্রায় সবই দেশিয় রাজার থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করিয়েছেন। রায় কৃষ্ণদাসজীর দানের অর্থে দুর্লভ কলাভবন নির্মাণ করিয়েছেন। হায়দরাবাদের নিজামের অর্থে শিক্ষক-অধ্যাপকদের আবাস নির্মাণ করিয়েছেন। আরও কত কিনা তাঁকে করতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান জনসম্পর্ক অধিকারী ড. রাজেশ সিংহ জানান, এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা

করছে। এর মধ্যে ১৮ হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে ৭৫টি ছাত্রাবাসে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'হাজারেরও বেশি শিক্ষক অধ্যাপক আছেন। অন্য কর্মচারীর সংখ্যা সাড়ে চার হাজার। ১৬টি শাখা এবং ১১৯ টি বিভাগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের নির্দেশক প্রফেসর এইচ বি শ্রীবাস্তব বলেন যে, বর্তমানে এখানে ৬৪টি দেশের ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এর মধ্যে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, তুর্কি, জার্মানি, ইংলন্ড ইত্যাদি দেশের ছাত্রও আছেন। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা সমাজবিজ্ঞান, সঙ্গীত, দৃশ্যকলা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করছেন। এখন বিশ্বের ৪৫টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

- এশিয়ার সবচেয়ে বড় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের ইন্টারনেটের সুবিধা নিঃশুল্ক দেওয়া হয়।
- নিজস্ব বিমানবন্দর, তাতে তিনটি হেলিপ্যাড আছে।
- মালব্য ভবনে প্রতি রবিবারে গীতাপ্রবচন হয়। মদনমোহন মালব্য নিজে করতেন। এখন গীতাসমিতি করে থাকে।
- গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের নিঃশুল্ক পড়াশুনা ও ভোজনের ব্যবস্থা আছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে নিঃশুল্ক বাস পরিষেবা।
- পরিসরে অ্যালোপ্যাথিক, হোমিও প্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সবার মতো ছাত্রদের জন্য নিঃশুল্ক।
- পরিসরে পশুহাসপাতাল নিঃশুল্ক।
- প্রত্যেক বিভাগে লাইব্রেরি।
- বিশাল গোশালা। কম পয়সায় দুধ পাওয়া যায়।
- সাইবার লাইব্রেরি ছাত্রদের জন্য নিঃশুল্ক।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সংস্থা 'মালব্য মূল্য অনুশীলন কেন্দ্র'-এর অধিকারী ড. উষা ত্রিপাঠী বলেন---রাজনীতি, সমাজসেবা ও জনজাগরণের নানান ক্ষেত্রে বহুবিধ উল্লেখনীয় কাজ করা সত্ত্বেও মালব্যজীর আত্মা অতৃপ্ত ছিল। শিক্ষায় পশ্চিমিকরণের কারণে শিক্ষার মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁর ভিতরে রক্তক্ষরণ হতো। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যেই তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরর কল্পনা তিনি ১৯০৪ সালে করেছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি কাশী নরেশের সঙ্গে এর রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রয়াগের মাঘ মেলায় সাধুসন্তদের কাছে তিনি তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেন। শৃঙ্গেরীমঠের তৎকালীন শঙ্করাচার্য সেসময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় আলোচনা বন্ধ থাকে। ১৯১১ সালে আবার আলোচনা শুরু করেন। তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁর ইচ্ছার কথা জেনে বলেন যেদিন ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়ে যাবে সেদিন থেকে নির্মাণকার্য শুরু করা যাবে। এরপরেই পণ্ডিতজী তাঁর ব্যক্তিগত সব কাজ ছেড়ে অর্থসংগ্রহে লেগে পড়েন। তার ফলে ১৯১৫ সালে ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়ে যায়। এরপর তিনি নির্মাণকাজে হাত দেন। ১৯১৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ১৬টি বিভাগ চালু হয়ে যায়। পরে পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশালরূপ ধারণ করে।

সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভারতের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। নাম— সয়াজীরাও গাইকোয়াড় কেন্দ্রীয় পুস্তকালয়। গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ ড. দেবেন্দ্র কুমার সিংহ জানান, বর্তমানে গ্রন্থাগারে ১৫ লক্ষেরও বেশি বই ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সোনার জলে লেখা ভাগবত গ্রন্থ রয়েছে। ১৬-শ শতাব্দীর তালপত্রের পাণ্ডুলিপি আছে, যাতে শৈবদর্শন, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদের মতো বিষয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক 'সাইবার লাইব্রেরি' আছে। ছাত্ররা এখানে নিঃশুল্ক পড়াশুনা করতে পারে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম কীভাবে

প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল 'বেনারস ইউনিভার্সিটি'। ১৯৪২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে গান্ধীজী এসেছিলেন। ইংরেজি নাম তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি মদনমোহন মালব্যকে বলেন, 'আপনি হিন্দীর এতবড়ো ভক্ত, ইংরেজি নাম কেন রেখেছেন? গান্ধীজীর ভাবনা পণ্ডিতজীর পছন্দ হয় এবং ঘোষণা করেন— এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' হলো।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে নতুন বিশ্বনাথ মন্দির। এই মন্দির প্রাচীন ও নবীন বাস্তুশাস্ত্রের এক অপূর্ব সংযোজন। মন্দিরের পিছনে সমস্ত ছাত্রাবাস যোজনাবদ্ধ ভাবে বসানো হয়েছে। যাতে ছাত্ররা খুব সহজেই নিজ নিজ বিভাগে পৌঁছতে পারে। প্রত্যেক সংস্থা বা শাখার সামনে তাদের ছাত্রাবাস। একটি খেলার মাঠ পেরিয়ে নিজ বিভাগে পৌঁছতে হয়। ছাত্রাবাসের পিছনে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের আবাসস্থল। পণ্ডিতজীর কী সুন্দর কল্পনা ছিল—ছাত্ররা যখন মনে করবেন শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের সমস্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৮৫ কিলোমিটার। প্রত্যেক রাস্তার দু'ধারে সুন্দরভাবে সারিবদ্ধ গাছ লাগানো রয়েছে। বৈশিষ্ট্য হলো, এক একটা রাস্তার পাশে একইরকম গাছ লাগানো হয়েছে। এজন্য ওই গাছের নামেই রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—আম লেন, জাম লেন, তেঁতুল লেন ইত্যাদি। বেশিরভাগই আমগাছ, কিন্তু তেঁতুল, জাম, বট, নিম, অশ্বত্থ, অশোক ও গুলমোহর গাছের সংখ্যাও কম নয়। আজ যেখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় আগে সেখানে

১১টি গ্রাম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরের বাইরে গ্রাম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাদের পাকাবাড়ি, পাকারাস্তা-সহ সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। পরিসরের বাইরে সুন্দরপুর ও আদিত্যনগর নামে দুটি গ্রামের আগের ১১টি গ্রামের লোকেদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। গ্রামে প্রতি পরিবার থেকে যোগ্যতানুসারে একজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার এ এক অনন্য উদাহরণ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর জন্য পণ্ডিতজী ছাড়া স্যর সুন্দরলাল, ড. পি এস শিবস্বামী আয়ার, ড. এস রাধাকৃষ্ণন, ড. অমরনাথ ঝা, আচার্য নরেন্দ্রদেবের মতো শ্রেষ্ঠ উপাচার্যদের তপস্যা, বুদ্ধি ও ত্যাগপূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে। পণ্ডিতজী আমৃত্যু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মালব্য ভবন'-এই থেকেছেন। প্রতিদিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরুতেন, যেদিন যে ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন সেদিন সেই ছাত্রাবাসের ছাত্ররা তাঁকে সঙ্গ দিতেন। প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র তাঁর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণ করতেন। প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করতেন পরিসরের কেন্দ্রস্থলের বিশ্বনাথ মন্দিরে। মন্দিরে পূজা অর্চনা সেরে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলে নিজের আবাসে আসতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই নিয়ম তিনি পালন করে গেছেন। যে কোনো ছাত্র যে কোনো সময় তাঁর সঙ্গে যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আসতে পারতেন। তিনি ছাত্রদের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। বারাণসী শহরে কামচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিদ্যালয় আজও পূর্ণ মর্যাদায় শিক্ষাপ্রদান করে চলেছে। ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এই বিদ্যালয়গুলিতে চলত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের দক্ষিণ দিকে ফ্লাইং ক্লাবের তিনটি রানওয়ে আছে। ফ্লাইং ক্লাবের মাধ্যমে যে কোনো ছাত্র বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে পারতেন। এছাড়া ছাত্রদের জন্য 'হবি সেন্টার' রয়েছে। মালব্যজী সবসময় চাইতেন ছাত্ররা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করুক। এজন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ নিজেরাই তৈরি করে। ছাত্র ও কর্মচারীরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কলেজের কারখানায় অনেক জিনিস তৈরি করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুরনো পাখাগুলি ছাত্ররাই তৈরি করেছিলেন।

সয়াজীরাও গাইকোয়াড় কেন্দ্রীয় পুস্তকালয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (নীচে)।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পাশে 'পাওয়ার হাউস' ছিল। সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হোত। তখন বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ নেওয়ার প্রয়োজন হোত না। পাওয়ার হাউসের চিমনি দূর থেকেই সবাই দেখতে পেতেন। আশির দশকে ভয়ঙ্কর তুফানে চিমনি ভেঙে পড়ে।

ষাটের দশক পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে আমিষ ভোজন ও মদ্যপানের ওপর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সমস্ত ছাত্র আন্তরিকভাবে এই নিয়ম পালন করতেন। কিন্তু পরে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে এই নিয়ম শিথিল করা শুরু হয়। তার খারাপ প্রভাব অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়েকে গ্রাস করে। ষাটের দশকের শেষদিকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করায়। ফলস্বরূপ এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৫ সালে উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন ড. আর. পি. রস্তোগী। তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বমহিমা প্রদান করেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে মন্দিরশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। উপাচার্য-কার্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরের বাবা বিশ্বনাথ মন্দির একটু দূরে হলেও সামনাসামনি অবস্থিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর কল্পনা ছিল যে, বাবা বিশ্বনাথের সামনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বসবেন। তার ফলে ভোলানাথ শঙ্করের আশীর্বাদ উপাচার্যের ওপর সবসময় বর্ষিত হবে। ■

পুরাণের গল্প

গণেশের বিয়ে

পুনর্কথন : দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়

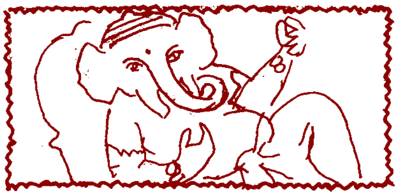

গণেশ আর কার্তিক পিঠোপিঠি ভাই। দুজনেই বড় হয়েছে। যুদ্ধবিদ্যা ভালো শিখেছে। কে আগে বিয়ে করবে তা নিয়ে কথাবার্তা। কার্তিক আগে বিয়ে করতে চায়। গণেশ বলে সে আগে করবে। বড় সমস্যায় পড়লেন তাদের বাবা-মা—শিব আর পার্বতী। দুজনেই অনেক আদরের ছেলে। কারও কথাই অগ্রাহ্য করা যাবে না। ভেবেচিন্তে এমন একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে যাতে কেউ অখুশি না থাকে।

শিব বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আগে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তার বিয়ে দেওয়া হবে আগে।'

কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল ময়ূরের পিঠে চড়ে। গণেশের চেহারা নাদুসনুদুস। বড়সড় ভুঁড়ি। খাটার ক্ষমতা কম। কিন্তু বুদ্ধি কম নয়। গণেশ ভাবতে লাগল কি করা যায়! ভাবতে ভাবতে সে একটা উপায় খুঁজে পেলো।

চানটান করে নতুন কাপড় পরে বাবা-মাকে বলল, 'আপনারা এখানে আসনে বসুন। আমি আপনাদের পুজো করব।'

শিব আর পার্বতী তাই করলেন খুশি মনে। গণেশ তাঁদের পুজো করল। পুজোর পরে সাতবার মা-বাবার চারপাশে ঘুরল। তারপর বলল, 'আমার কাজ শেষ। এবার আমার বিয়ে দিন।'

শিব অবাক। বলা হলো যে আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তার বিয়ে আগে হবে। কার্তিক ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছে। গণেশ কুঁড়ে। এতক্ষণ বসে থেকে কৌশল আঁটছে। শিব বললেন, 'তোমাদের আগেই বলা হয়েছে যে প্রথম পৃথিবীর চারদিক ঘুরে আসবে তার বিয়ে আগে হবে। কার্তিক ঘুরছে। তুমি তো কিছুই করলে না। আবার দাবি করছো?'

গণেশ বলল, 'আমি তো সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলাম, তবু আপনি এরকম বলছেন কেন?'

শিব একটু বিস্ময়ে বললেন, 'কোথায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলে!'

গণেশ বলল, 'এই তো আমি আপনাদের সাতবার প্রদক্ষিণ করলাম পুজো করার পর। শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, বাবা-মায়ের পুজো করে তাঁদের প্রদক্ষিণ করলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের কাজ হয়। শাস্ত্রের কথা ঠিক হলে আমার কাজে ভুল নেই। এতএব আমার আগে বিয়ে দিন।'

শিব-পার্বতী দুজনেই খুশি গণেশের যুক্তিভরা কথায়। বললেন, 'ঠিকই বলেছো বাবা। তোমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ হয়েছে— এটা মানছি।'

গণেশের বিয়ের ব্যবস্থা হলো। দুটি কন্যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক। কন্যা দুটির নাম বুদ্ধি আর সিদ্ধি। বিয়ে হয়ে গেল।

এর কিছুদিন বাদে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ক্লান্ত কার্তিক ফিরল। ঠিক ওই সময়ে নারদ মুনি এসে হাজির। কার্তিককে বললেন তিনি, 'তোমার বাবা মায়ের কাণ্ড একবার দেখলে তো! তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণে পাঠিয়ে সুযোগ মতো বড়োছেলের বিয়ে দিয়ে দিল। এবার তুমিই ভাবো কি করবে!'

কার্তিকের রাগ আর অভিমান ভালোই হলো। চুপচাপ এসে বাবা মাকে প্রণাম করে চলে গেল ক্রৌঞ্চপর্বতে।

বাবা-মা বললেন, 'কোথায় যাচ্ছো? তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

কার্তিক শুনলে না সেকথা। বলল, 'আপনারা আমাকে ফাঁকি দিয়েছেন। আমি আর আপনাদের সঙ্গে থাকব না।'

মা-বাবার মন বলে কথা। ছেলের জন্যে কষ্ট তো হবেই। শিব- পার্বতীও ছোট ছেলের কাছে থাকবেন বলে ক্রৌঞ্চপর্বতে চলে গেলেন।

কার্তিক ওখানে থাকবে না ঠিক করল। তখন দেবতারা তাকে বোঝালেন, 'বাবা-মা খুব কষ্ট পাবেন তুমি দূরে চলে গেলে। কাছাকাছি না থাকো ওখানেই বারো ক্রোশের মধ্যে থাকো।'

কার্তিক রাজি হলো। শিব-পার্বতী খুশি। কার্তিকের বিয়ে আর হলো না। ছোট ছেলে বিয়ে করেনি। অতএব তার জন্যে মা-বাবার ভাবনা কোনোদিন শেষ হবার নয়।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

আশেপাশে

ছুটির দিনে গ্রাম-সমীক্ষা

ছুটির দিনে কাছেপিঠের একটা গ্রামে দলবেঁধে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হলো। একেবারে অচেনা গ্রাম নয়। আগে থেকে বলাকওয়া না থাকলে আজকাল কোথাও যাওয়া বেশ ঝুঁকির। লোকজন সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। অচেনা গাঁয়ের লোকজন প্রথম দেখে ভুরু কুঁচকিয়ে তাকাবে। মনে মনে বলবে, 'কি মতলবে এখানে?' সৌজন্য বজায় রেখে কথার পিঠে কথা বলে রেহাই মিলবে না। শুনতে হবে কথা, 'আমাদের গ্রাম আমাদের থাকুক আপনাদের কিছু জানতে করতে হবে না। এর আগে একদল এসে মন্দির থেকে পোড়ামাটির কাজ খুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

গ্রামের লোকের সন্দেহ অবিশ্বাস হঠাৎ জাগেনি। দিনে দিনে ওইরকম অবস্থা তৈরি হয়েছে। শুভদীপরা যে গ্রামে যাবে ঠিক করেছিল সেখানে ওদের বন্ধু সপ্তর্ষিদের গ্রামের বাড়ি। অতএব অসুবিধে নেই কোনো। গ্রামের ভিতরে গাড়ি ঢুকে যায়। দশজনের দল সকালে সাতটায় বেরিয়ে সাড়ে আটটায় ঢুকে পড়ল গ্রামে। সপ্তর্ষিদের বাড়িতে সব ব্যবস্থা করা ছিল। নেতৃত্বে কল্যাণ-স্যার। গ্রাম-সমীক্ষার কাজ করবে ওরা। সঙ্গে এনেছে নোটখাতা, কলম, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার। সপ্তর্ষিদের দুই কাকা চারজন করে দুটো দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল খাওয়ার পর। সপ্তর্ষি আর গাড়ির চালক রইল। আগে থেকে কিছু প্রশ্ন তৈরি ছিল। তার সঙ্গে কিছু যোগ হবে। বলে দেওয়া হলো, দুপুরে খাওয়ার আগে ফিরে আসবে। গ্রাম সমীক্ষার শেষে বিকেলে ওদের জন্যে গ্রামের নাচগানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাড়ে ছটায় ওরা গাড়িতে উঠল। শহরে পৌঁছোল আটটায়।

বিপুল দাস

প্রশ্নবাণ

১.তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, শরদিন্দু— বাংলা সাহিত্যের এই চারজন স্রষ্টার পদবী কি?

২.ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম বাঙালি রাজ্যপাল কে? তাঁর আগে রাজ্যপাল হয়েছেন কজন?

৩.'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে ইন্দির ঠাকরুণ হয়েছিলেন কোন্ অভিনেত্রী?

৪.'পথের পাঁচালী'র দুর্গা অপুর বাবা-মায়ের নাম কি?

৫.'অতিথি', 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষান' কে লিখেছেন? চলচ্চিত্র রূপ কে দেন?

উত্তর : ১. বন্দ্যোপাধ্যায়। ২. তথাগত রায়। পনেরোজন। ৩. চুনিবালা দেবী। ৪. হরিহর-সর্বজায়া। ৫. রবীন্দ্রনাথ। তপন সিংহ।

ফিরে পড়া

ভারত-রানী

হরিশচন্দ্র নিয়োগী

(১৮৫৪-১৯৩০)

তুমি মা ভারত-রানী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রী-সম্পদরাশি, কোথা আছে সুষমার?
সভ্যতার এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী,
বিদ্যাবুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী, তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত,
গাইল মা, কবি-কণ্ঠে তোমার মহিমা শত।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য হীরক হার,
তব কণ্ঠে আসি রমা পরাইল অনিবার।

স্বর্গ হতে মন্দাকিনী ঝরি স্রোত-জলে তুমি,
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি।
বালার্ক কিরণে মাখি বিসর্পিত শ্যামকায়,
পুণ্যজলে তব অঙ্কে কৃষ্ণতোয়া বয়ে যায়।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা, নীলাকাশে
নির্মল রজতে মাখা হেন ফুলচন্দ্র হাসে?
কোথায় মা হেন দেশ যেখানে লাবণ্যধাম
মনোময়ী প্রকৃতি চারু চিত্র অভিরাম?

ভ্রূণহত্যা মহাপাপ

অঙ্গনা

লক্ষ্মী দাস

আজকের দিনে ছেলে-মেয়ের কোনো তফাত নেই— একথা মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে অনেকেই মানেন না। বংশ রক্ষা করার জন্য ছেলে না হলেই নয়। আর মেয়ে মানেই তাকে খাইয়ে, পড়িয়ে পরের বাড়িতে পাঠাতে হবে। তাই ছেলে হলে আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করা হয় আর কন্যা হলে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস, কত চিন্তা, কীভাবে তাকে বিয়ে দেবে, কত খরচ ইত্যাদি। এই আধুনিক যুগেও শিক্ষিত সমাজে খুব কম পরিবার আছে, যাঁরা প্রথম সন্তান মেয়ে হলে হাসিমুখে পরিবারের সদস্য বলে মেনে নেন। কোনো কোনো বাড়িতে মেয়ে হয়েছে বলে সদ্যোজাত শিশু এবং তার মায়ের উপর চলে নির্যাতন। আবার কোথাও দেখা গেছে, ছেলের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে পাঁচ- পাঁচটি কন্যা সন্তান হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবে দেখছেন না এভাবে পরিবার কত বড় হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সংসারে নানা রকম অভাব অনটন দেখা দিচ্ছে। তাদের পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ তাদের নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়? অবহেলায় অনাদরে তাদের বড় হতে হয়। রাস্তার ধারে ডাস্টবিনেও সদ্যোজাত শিশু পাওয়ার অনেক নজির আছে। জানি না মানুষ কীভাবে এত নিষ্ঠুর হতে পারে! নাই বা হলো ছেলে, মেয়েকেই ছেলের মতো করে মানুষ করলে একদিন সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। একটা ছেলে মানুষ করতে যেমন খরচ হয়, তেমনি মেয়ের ক্ষেত্রেও। আবার ছেলেকে বিয়ে দিতে যেমন খরচ হয়, তেমনি মেয়ের ক্ষেত্রেও। আবার একটা ছেলের বিয়ে দিতে গেলেও একটা মেয়েকেই দরকার হয়। তবে কেন এই বৈষম্য?

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির ফলে আমরা খুব সহজেই জানতে পারি গর্ভস্থ শিশুটির অবস্থান, আকৃতি, গঠন, এমনকী পুত্রসন্তান না কন্যাসন্তান। তাই বলে কি কন্যা সন্তানটিকে কুঁড়িতেই নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে? কেন সে এই পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না, কেন সে এই সমাজের এক জন সদস্য হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে? সে তো কারো কোনো ক্ষতি করেনি, তবে কেন তার ওপর এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার। এধরনের কাজ করার আগে একটুও কি মনে হয় না যে, এটা কত পাপ! এমন কত পরিবার আছে যাদের একটা শিশুর জন্য হাহাকার করতে হয়। আবার এমন কত পরিবার আছে তাদের অনায়াসে হত্যা করছে। এভাবে হত্যা করতে গিয়ে কত সময় তো মাকেও জীবনের অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। মায়ের জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। এভাবে কন্যা সন্তানের কমে যাওয়ার ফলে ছেলে ও মেয়ের অনুপাত কমে যাচ্ছে। এটা ভুললে চলবে না যে ছেলে ও মেয়ে একে অন্যের পরিপূরক। এতে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কথা কে না জানে! এখন আমাদের কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, তিনিও তো মেয়ে হয়ে দেশের সেবা করছেন। এঁরাও আমার আপনার বাড়ির মতো সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। সুতরাং আজকের দিনে মেয়েরা কোনো অংশেই ছেলের থেকে কম নয়। তারাও আজ শুধু ঘরে বসে না থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অলিম্পিকে, এশিয়াড গেমসে দেশকে পদক এনে দিচ্ছে, দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। এটা আমাদের কাছে কি গর্বের বিষয় নয়? মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, অফিস-কাছারিও করছে, ব্যবসাও করছে, ঘরে এসে সংসারও সামলাচ্ছে, আবার বাচ্চাকেও মানুষ করছে। দশভুজার মতো দশদিক সামাল দিচ্ছে। এর জন্য অবশ্যই পরিবারের সহযোগিতা একান্ত দরকার।

মেয়েরা ছাড়া সমাজ হতে পারে না। তাই মেয়েদের বাঁচাতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে বলছেন যে, 'একটা মেয়ে জন্মালে তার নামে পাঁচটা গাছ লাগাও। দেখা যাবে মেয়ে বড় হতে হতে গাছগুলো পরিণত হয়ে যাবে'। আর তখন তাদের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের জন্য কাউকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। এছাড়া সমাজের সকলের কথা তিনি ভেবে জন-ধন যোজনা চালু করেছেন।

জীবনে চলার পথে বাধা-বিপত্তি, সমস্যা তো থাকবেই, তাকে সুষ্ঠুভাবে সমাধানও করতে হবে। আইন করে এসব আংশিক বন্ধ করা গেলেও সবাইকে বোঝানো সম্ভব হবে না। তাই মেয়েদের সচেতন হতে হবে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। মেয়ে হয়ে মেয়েদের হত্যা নয়, রক্ষা করব— এই সঙ্কল্প গ্রহণ করলেই ভ্রূণ-হত্যার মতো পাপাচার সমাজ থেকে দূর করা যাবে। তবেই সুন্দর কুঁড়িগুলো আর অকালে দলিত মথিত না হয়ে সুন্দর সুন্দর ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে আমাদের সমাজ। ■

পৃথিবীতে মোদী একা নন, আরও বহু নেতাই বিদেশ সফর করে থাকেন আর গালমন্দ খান

অতিথি কলম

চিদানন্দ রাজঘাট্টা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত এক বছরে ১৮টি দেশে সরকারিভাবে সফর করেছেন। এই কারণে তাঁকে দেশের বাইরে ৫৩ দিন কাটাতে হয়েছে। দেশের বিরোধী দলগুলি এই নিয়ে তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করার কসুর করছে না। হ্যাঁ, এই ভ্রমণের গতি অবশ্যই একটু উপর্যুপরি হয়েছে এটা ঠিকই। তবে আজকের দুনিয়ায় বড় বড় কোম্পানির কর্তারাও সদা-ভ্রমণরত রয়েছেন। অবশ্যই তাঁদের ব্যবসা বৃদ্ধির কারণে। এটি খুবই পরিচিত পদ্ধতি। তুলনামূলক বিচারে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তাঁর ইউপিএ-২ এর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছরে ঘুরে ছিলেন ১২টি দেশে, সেই সুবাদে দেশের বাইরে ছিলেন ৪৭ দিন। ১০ বছরের সামগ্রিক প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় সীমায় মনমোহন পৌঁছেছিলেন ৭৩টি দেশে যে সংখ্যাটি জওহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তাঁদের সময় দেশের সংখ্যাও ছিল কম আর বাধ্যবাধকতাও ছিল অন্যরকমের। আমেরিকাবাসীরা বলত তাঁর প্রথম দফার ৪ বছরে রাষ্ট্রপতি ওবামা নয় নয় করে ৩৫টি দেশে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় আর একটু ধীর গতিতে আরও ১৫টি দেশে তিনি সফর করেন। এখন পর্যন্ত তাঁর সফর করা দেশের সংখ্যা ৫০টি। এর সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের ৫০টি রাজ্যও তিনি অবশ্যই ভ্রমণের আওতায় রেখেছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতিবেশী পাকিস্তান ও পূর্বতন শাসকের দেশ বৃটেন কিন্তু আজও প্রধানমন্ত্রীর সফর তালিকায় নেই। অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে কিনা সেরকম খবরও নেই। রাষ্ট্রনেতাদের সফরসূচি যথাযথ নিরীক্ষণ করলেই আজকাল প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে একটি দেশের গুরুত্বের তালিকা ও ক্ষমতা বৃত্তের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন দেশ তার কাছে এগিয়ে আছে আর কেউ-বা গুরুত্বহীন।

এখন হিসেব করে দেখা গেছে রাষ্ট্রপতি ওবামা দেশ ও বিদেশের বহু স্থানই তিনি একাধিকবার সফর করেছেন। এর সঙ্গে তাঁর বাৎসরিক দু'টি ছুটি কাটানো পর্ব ধরলে তিনি তাঁর কার্যকালের ৫০ শতাংশ সময়ই ওয়াশিংটনের বাইরে দিলেন। বাড়তি হিসেবে প্রেসিডেন্টের প্রায়ই গল্ফ বাতিক বা বাস্কেটবল অ্যাডভেঞ্চার যোগ করলে মনে হতে পারে রাষ্ট্রপতি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে দেশের রাজধানীর বাইরে থাকলেই সেই সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধান সঠিকভাবে তাঁদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য পালন করছেন না? মনে তো হয় না! আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের নিরিখে নেতা বা কর্তাব্যক্তিরা সফর চলাকালীন তাঁদের জরুরি কাজকর্ম সবই সঙ্গে নিয়ে যান এবং যথাবিহিত সমাধা করেন।

প্রসঙ্গত আমেরিকার Air Force-I ও ভারতের Air India-I উভয়ে মধ্যেই অফিস চালানোর মতো বিশেষ পরিকাঠামো রয়েছে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানদের বিদেশ সফরের সময় কোনো অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় কাজকর্ম বা ফাইল আটকে থাকে না। সব কাজই সময়ে হয়। রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টন ও বুশ তাঁদের দু'টি দফায় আমাদের মনমোহন সিংহের মতোই দু' জনেই ৭৪টি করে দেশ সফর করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সদাই মজুত ছিল আকাশসঙ্গী চটজলদি দপ্তর ও জমিতে নামার পরও অধীনে চলত প্রয়োজনমাফিক অফিস। নিশ্চয় এগুলি বিশেষ খরচ সাপেক্ষ। ড. মনমোহন সিং-এর দশ বছরে খরচ হয়েছিল ৬৭৬ কোটি টাকা। রাষ্ট্রপতি ওবামার ক্ষেত্রেও এই অর্থের পরিমাণ নিয়ে আমেরিকায় ক্ষোভ রয়েছে।

কিন্তু ইত্যাকার সমালোচনার পরও যদি দেখা যায় এই নেতারা তাঁদের সফরের মাধ্যমে দেশে নিয়ে আসছেন হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ, দেশের অনুকূল

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, সৃষ্টি করাচ্ছেন অসংখ্য চাকরি, সুদৃঢ় করছেন দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তখনও কি এই দোষারোপ ধোপে টিকবে?

আজকের দিনে একটা হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু বাদাম চাষ করে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ১১ বিলিয়ন ডলার অর্থাগম হয়েছে, আবার গুজরাট-রাজস্থানে এক বিশেষ রকমের আঠার কারবারে ৩ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়েছে। তখন মিলিয়ন ডলারে হিসেব করে (প্রায়ই ক্ষোভের বসে বাড়িয়ে বলা হয়) ভ্রমণ খরচ মনে হয় ধর্তব্যের আনা চলে না। সারা বিশ্বব্যাপীই এখন দেশনায়কদের সফর ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। কেননা ছোট-বড় সব দেশই একে অপরের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

আজকাল আবার নানান আন্তর্জাতিক ফোরাম ব্যাপক সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করায় রাষ্ট্রপ্রধানদের সেখানে যোগদান করা একরকম বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেই G 20, Brics, IBSA (India Brazil, South Africa, East Asia Summit) এমন নানান বহুদেশীয় সংস্থায় সম্পর্ক নিজের প্রয়োজনেই বজায় রাখতে হচ্ছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আজকের দিনে খানিকটা লৌকিকতা কিছুটা কৌশলগত বাধ্যবাধকতার কথাটা মেনে চলতেই হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে আমেরিকা-সহ অধিকাংশ দেশই এখন প্রতিবেশীদেশকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। আজকের আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের কাছে ওটাওয়া, কানাডা অবশ্য গন্তব্যের তালিকায়। অন্যদিকে বুশ বেছে ছিলেন মেক্সিকো। নজর করলে দেখা যাবে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি পুতিনের তিন তিনটি শাসন পর্যায়ে তিনি সর্বদাই প্রতিবেশী বেলারুস, ইউক্রেন, কাজাকস্থান, আজার বাইজান প্রভৃতি দেশগুলিতে সফর করেছেন। উদ্দেশ্য যাতে দেশগুলি রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। রাশিয়াও তার প্রভাব জারি রাখতে পারে। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। চীনের জি জিং পিং তাঁর প্রথম ২৬ মাসের মধ্যে ২০টি দেশে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সফর করেন। এর মধ্যে কার্যভার নেওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যেই ২০১৩ সালে তিনি রাশিয়া যান।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরগুলি তাই কখনও লৌকিকতা রক্ষা, চরম কৌশলগত প্রয়োজন, কখনও বা নিখাদ ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানো আবার বহু ক্ষেত্রেই বহুমুখী দায়বদ্ধতা রক্ষার (G-20, Brics) কারণে ঘটে চলেছে। লক্ষ করলে দেখা যায় মোদীর প্রারম্ভিক সফর ছিল ভুটান। এরপর Brics-এর সম্মিলিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্রাজিলে প্রতিনিধিত্ব করেন। ফিরেই যান নেপাল। এর পরই আসে শ্রীলঙ্কা, মরিশাস ও সেচেলেস। এগুলির কারণ প্রতিবেশী দেশগুলির গুরুত্ব বাড়ানো ও পারস্পরিক সংহতি বৃদ্ধি করা। প্রসঙ্গত, প্রায় শুরুর দিকেই জাপান ও সেপ্টেম্বর ২০১৪-র আমেরিকা সফর মূলত ছিল মোদী ও ভারতের পক্ষে অতি সূক্ষ্ম দাবার দান ঠিক করে নেওয়া, যার কিছুটা পরিপূরক হিসেবেই আসে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ব্যবসা বৃদ্ধি করার মোড়কে চীন সফর। এর পরের দফায় রয়েছে রাশিয়া। চীনের ঠিক পরে পরেই মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সফরগুলির মধ্যে জড়িয়ে ছিল তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক কৌশল যার চক্রাকার সমাপ্তি ঘটবে ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে পরবর্তী সময়ের সফরের মাধ্যমে। এখানে আরও একটি বিষয় সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। এ যাবৎকালের সমস্ত সরকারই বেশ খানিকটা পাশ্চাত্য আধিপত্যের অবচেতন প্রভাবে ভুগত কিন্তু আজকের নতুন 'পশ্চিমে তাকাও' নীতি তাতে গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এর মানে অবশ্যই এই নয় ব্যবসামনস্ক মোদী কখনই পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাহলে তারপর জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডায় সফর হলো কি করে?

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতিবেশী পাকিস্তান ও পূর্বতন শাসকের দেশ বৃটেন কিন্তু আজও প্রধানমন্ত্রীর সফর তালিকায় নেই। অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে কিনা সেরকম খবরও নেই। রাষ্ট্রনেতাদের সফরসূচি যথাযথ নিরীক্ষণ করলেই আজকাল প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে একটি দেশের গুরুত্বের তালিকা ও ক্ষমতা বৃত্তের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন দেশ তার কাছে এগিয়ে আছে আর কেই-বা গুরুত্বহীন। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

মানবতার জাগরণে শিক্ষা

অধ্যাপক ধনঞ্জয় রায়

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে নরেন্দ্রনাথের যিনি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। একদিন ঠাকুর স্বামীজীকে বেশ কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বললেন যে, সংসারে ভীষণ অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট। তাই রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। শুনে ঠাকুর বললেন, "নিজের কথা ভাবলে চলবে? জগতের জন্য তোকে ভাবতে হবে তো! আচ্ছা যা, মায়ের (মা-কালীর) কাছ থেকে তোর অভাব অনটন দূর করবার প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে নে। মায়ের কাছে যা চাইবি— তাই পাবি"। স্বামীজী বারে বারে গিয়েও মায়ের কাছে অর্থ বা টাকাকড়ি চাইতে পারলেন না। পরিবর্তে প্রতি বারেই চাইলেন— জ্ঞান, ভক্তি ও বিবেক। কিন্তু স্বামীজী এগুলো দিয়ে কি করবেন? এতে কি সংসারের অভাব দূর হবে! আসলে স্বামীজীকে দিয়ে ঠাকুর মানুষকে একটি নীতি-শিক্ষা দিলেন— অর্থ বা পার্থিব কিছু দিয়ে অভাব অনটন বা দুঃখ-দুর্দশা ঘোচানো যায় না। দুঃখ-কষ্টকে দূর করার চেয়ে দুঃখ কষ্টকে জয় করাই হলো দুঃখ কষ্ট থেকে দূরে থাকার শ্রেষ্ঠ উপায়। একজন প্রকৃত মানুষ পারে সুখ দুঃখের উপরে উঠে অবিচল থাকতে। তাই সংসার, সমাজ ও দেশে শান্তি স্থাপনে প্রকৃত ভালো মানুষের বিশেষ প্রয়োজন।

প্রকৃত মানুষের বৈশিষ্ট্য কী? জ্ঞান, ভক্তি ও বিবেক সম্পন্ন মানুষই প্রকৃত মানুষ। জ্ঞান ভালো-মন্দ বাছতে সাহায্য করে; ভক্তি মূল্যবোধ জাগ্রত করে যার দ্বারা কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। বিবেক মানুষকে সংবেদনশীল ও সহ-মর্মী করে তোলে এবং পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথাটাই যথার্থভাবে কবিতার লাইনে প্রকাশ করেছেন, "...প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"।

ভালো মানুষ তৈরি করার চাবিকাঠি কী? মানুষ গড়ার কাজ শিশুকাল থেকেই শুরু করা উচিত। শিশুদের মন একটি সাদা কাগজের মতো স্বচ্ছ এবং কাদামাটির মতো নরম। যেমন রঙ দিয়ে দাগ করা হবে তেমনি রঙ ভেসে উঠবে। আবার কালো বা খারাপ বিষয়ে দাগ করলে খারাপটাই ভেসে উঠবে। একবার লেখার পরে মুছে ফেললেও সাদা পাতায় ফেরা

যায় না। মনের সাদা পাতায় তার চিহ্ন বা হালকা দাগ থেকে যায়। এই দাগ ক্ষত হয়ে ভবিষ্যতে কখনো কখনো আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই খুব সচেতন ও সতর্কভাবে শিশুদের সাথে ব্যবহার করা উচিত।

শিক্ষা দু-রকমের হওয়া উচিত। প্রথমটি অবশ্যই মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরির নিমিত্ত এবং দ্বিতীয়টি হলো জীবিকার প্রয়োজনে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করা। হিন্দু সংস্কৃতি অনুযায়ী বলা যেতে পারে প্রথম কাজটি হয়ে আসছে পুরাকালের গুরুর-আশ্রম থেকে। পরবর্তীকালে জীবিকার প্রয়োজনে বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তখন মানুষ গুরুর আশ্রম ছেড়ে বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে। তাই দুটি শিক্ষাই বিদ্যালয় থেকে হওয়া উচিত। তবে মানুষ করার কাজটি শিক্ষিত করে তোলার থেকে একটু কঠিন ও সূক্ষ্ম। তাই মানুষ গড়ার কাজটি অতি সযত্নে সচেতন ভাবে করা দরকার।

মানুষ গড়ার কাজ কেবল বিদ্যালয়ের উপর ছাড়লে চলবে না। বাড়িতেও উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। শিশুরা স্কুলে থাকে মাত্র ৬ ঘণ্টা, বাড়িতে থাকে ১৮ ঘণ্টা। প্রথমে আলোচনা করা যাক্ শিশুদের কোন কোন বিষয়গুলির বিকাশের প্রতি আমাদের জোর দেওয়া দরকার :

(ক) শরীর-স্বাস্থ্য : প্রথমে প্রয়োজন বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর। সুস্থ শরীরই পারে একটি সুন্দর মনকে ধরে রাখতে। তাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও উপযুক্ত খাবার দিতে হবে। শিশু অপুষ্টি দূর করতে হবে।

(খ) ভাষা : সঠিক ও সুন্দর ভাষা দিয়ে শিশুরা তার নিজের চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগ অন্যের কাছে বলতে পারে। মনের সুকুমার ভাবগুলি যেমন চঞ্চলতা, সরলতা, পবিত্রতা ইত্যাদির বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। তাই যে ভাষাতে শিশুরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে সেই ভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। তবে জীবিকার প্রয়োজনে অন্য ভাষার দক্ষতাও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

(গ) সামাজিক : ঘরে, সমাজে প্রতিনিয়ত মানুষকে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেকে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। ভদ্র আচরণ, নম্র কথাবার্তা, সহমর্মিতা ও যুক্তিনির্ভর মতামত প্রকাশের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। ভেদাভেদ না করে নিজেকে নিঃশেষ করে ফুল যেমন রঙ ও গন্ধ বিলিয়ে অন্যকে খুশি করে, তেমনি নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে সমাজের সেবা করার মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার। সমাজের কাছে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে।

(ঘ) দক্ষতা : প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। প্রত্যেকটি কাজের একটি কলাকৌশল বা ধারা রয়েছে। যে যতটা কৌশলগতভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে সে তত ভালো ফল পাবে। বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল শিখতে ও রপ্ত করতে হয়। দক্ষতার সাথে দূরদর্শিতা মেশানো থাকলে তবেই চূড়ান্ত ফল পাওয়া যায়।

(ঙ) অনুভূতি : আধুনিককালে আমরা প্রায় সকলে রোবটের কথা জানি। আগে বর্ণিত চারটি গুণে সমৃদ্ধ রোবট অনেক কাজ করে। কিন্তু সে কাজ মানুষ দ্বারা কৃত কাজের মতো পূর্ণতা পায় না। দেখতে অতীব সুন্দর মূর্তির মধ্যে কেবল 'প্রাণ' নেই বলে সে যেমন

প্রতিমাই রয়ে যায়, 'প্রাণ'-নেই বলে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো যেমন শুধুই ছবি— তেমনি অনুভূতি বা চেতনা নেই বলে রোবট কখনই মানুষ হবে না। অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত বা সংবেদনশীলতার রসে জারিত হয়ে কোনো কাজ সম্পন্ন হলে সে কাজ থেকে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়। এহেন মহার্ঘ্য অনুভূতির অঙ্কুরোদ্গম হয় এই শিশুকালেই। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এদের বিকাশ ও প্রকাশ পূর্ণতা পাবে।

পূর্বে বর্ণিত গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ আমরা শিশুদের মধ্যে দেখতে চাই। কিন্তু তাতে বড়দের কি করণীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Education is the manifestation of perfections which is already in man"— মানবধর্মী গুণগুলি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে— শিক্ষার দ্বারা তাদের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি মানব মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে দিলে তা সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করে এবং পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। কীভাবে এই পরিবেশ রচনা করা যায় ঃ

(১) খুশিতে রাখা : শিশুদেরকে সবসময় খুশিতে রাখতে হবে। দুঃখ বা কালোছায়া শিশুমনে না পড়ে। রঙিন জিনিসের প্রতি শিশুদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বা আগ্রহ থাকে। তাই রঙিন পোস্টার বা ব্যানারের মাধ্যমে লিখে বা ছবি এঁকে সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়। করণীয় ও অকরণীয় কাজগুলিকে উদাহরণ হিসেবে ছবির সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা দিলে, আলোচনা করলে সহজে বোধগম্য হবে। শিশুমন খোলা আকাশে উড়ে বেড়ানো বিহঙ্গের মতো মুক্ত থাকতে চায়। এই মন ভালো-মন্দ বোঝে না। সবকিছুকে সমানভাবে গ্রহণ করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। তাই খেলাধুলার সময় রাখতে হবে। এতে করে তাঁর শরীর গঠন যেমন হবে তেমনি অন্যের সঙ্গে মিশতে শিখবে, সহমর্মী হয়ে উঠবে।

(২) প্রশংসা ও পুরস্কার : অনুচিত কাজ করলে শিশুকে তিরস্কার করা নয়। তাতে শিশুমনে অখুশির ছায়া পড়বে। খারাপ কিছু করলে তাকে তিরস্কার না করে যে তুলনায় ভালো কাজ করল তার প্রশংশিত করা ও পারলে পুরস্কৃত করা উচিত। প্রত্যেক শিশুই নতুন নতুন রঙিন জিনিস পেতে চায়। পুরস্কারের রঙিন জিনিসগুলো পাওয়ার টানে শিশুরা ভালো কাজটি করতে চাইবে। নিজের থেকেই মন্দ পথ থেকে সরে আসবে। করণীয় ও বর্জনীয় কাজের সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হবে।

(৩) নীতি শিক্ষা : করণীয় ও বর্জনীয় কথা বা কাজ সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত শিশুকে মনে করিয়ে দিতে হবে। তবে মুখে মুখে না বলে যদি গল্পের মধ্য দিয়ে নীতি কথা বলা যায় তাহলে বোধ হয় বাচ্চাদের বুঝতে ও মনে ধরে রাখতে সহজ হবে। গল্প বাছাই এর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অনুভূতিগুলোর যেমন দয়া, সেবা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, মানবিকতার প্রকাশ থাকে।

(৪) আচরণ-শিক্ষা : অন্যের সাথে মেলামেশা করতে গেলে বা ভাব আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে কিছু রীতিনীতি বা আচরণ বিধি মেনে চলা উচিত। নিয়ন্ত্রিত জীবন তৈরির জন্য কিছু কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যেমন সারিবদ্ধভাবে হাঁটা, গ্রুপ পি টি করা। এর দ্বারা অনুসরণ করা, নিয়মানুবর্তিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা এবং অন্যকে বুঝবার শিক্ষা লাভ করে।

পরিশেষে, প্রথা-ভিত্তিক বিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে নন-ফরমাল বা অল টাইম এডুকেশন চালু রাখা দরকার। গৃহশিক্ষায় কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং যুক্তি দিয়ে ভালো, মন্দ বোঝানো উচিত।

চোখে দেখা বাস্তব ঘটনার থেকে আহৃত নীতি কথা বা উচিত কাজ কোন্‌টি তা বোঝানো, নীতি-কথা বা ভালো কথার আলোচনা শোনা— ইত্যাদির মাধ্যমে মনের অন্তরস্থিত শুভবোধগুলির দ্রুত বিকাশ ও প্রকাশলাভ সম্ভব। ∎

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত গবেষণামূলক অনবদ্য গ্রন্থরাজি—

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা	- ১৫০.০০	অন্তিম গতি : আল্লার পতিতালয়	-	১০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রতিখণ্ড	- ১০০.০০	ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা	-	১৫.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি	- ৭০.০০	इसलाम के तीन सिद्धान्त	-	১৫.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম	- ১২.০০	Three Decrees of Islam	-	২০.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা	- ১০.০০	Falsehood shrouds the True History of Delhi and Agra	-	১৫০.০০
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা	- ৩৫.০০			
এক নজরে ইসলাম	- ৪০.০০			
বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যত	- ৪.০০			
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত	- ৩.০০			

—: প্রাপ্তিস্থান :—

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, যোগাযোগ : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫, ৯৪৩৩০৩৩২৬৪

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

পরিবেশ দূষণ এবং আমাদের কর্তব্য

সুতপা বসাক ভড়

ধরিত্রীমাতার সঙ্গে আমরা যে অবিমৃশ্যকারীর মতো ব্যবহার করেছি, তার পরিণাম আজ আমাদের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। এর দুষ্পরিণাম আমরা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছি। কিছু বছর আগেও যেখানে ঘন জঙ্গল ছিল, আজ সেখানে কংক্রিটের বিশাল বিশাল অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো পুকুর, ডোবা, খালগুলির আজ অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কিছু জলাশয় যাও বা আছে তা সেগুলোও বছরের বেশিরভাগ সময়েই শুকনো পড়ে থাকে। জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক জীবজন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিছু বিলুপ্তির পথে। কৃষিকার্যে ফসলের উৎপাদনের হার ধীরে ধীরে কমের দিকে। নিত্যনতুন অসুখের প্রাদুর্ভাবে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছি। সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে চলেছে। পরিবেশের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমরা অসামঞ্জস্য এনে ফেলেছি।

জঙ্গল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, নদী, জীবজন্তু ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ধরিত্রীমাতার অলঙ্কার। সেই অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে আজ আমরা তাকে নিঃস্ব করতে চলেছি। তাঁর সৌন্দর্যের হানি আমরা পদে পদে করে চলেছি। নিজেদের স্বার্থের জন্য ধরিত্রীর খুব শোষণ করেছি, তার পরিণাম আজ আমাদের সামনে। আমরা কি ভুলতে বসেছি যে এই পৃথিবী আমাদের? জল, জঙ্গল ও জমি আমাদের? আমরাই এগুলি ব্যবহার করি? আজ যদি পৃথিবীর এইসব অঙ্গাঙ্গি জড়িত জিনিসগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এই সঙ্কট কে দূর করবে? প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সার্বজনীন দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন : দীর্ঘদিন ধরে যখন আবহাওয়াতে পরিবর্তন আসে তখন তা ঋতুগুলিকেও প্রভাবিত করে। ফলে, আমরা আগের মতো করে ঋতুগুলিকে পাই না। এই পরিবর্তনগুলিকে সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। এর কারণ হিসাবে আমরা green house effect, depletion of ozone layer ইত্যাদিকে দায়ী করতে পারি, যা তথাকথিত মানবসভ্যতার অগ্রগতির দান।

বায়ু প্রদূষণ : কয়েক কোটি লোক কয়লা এবং অন্যান্য ইন্ধন ব্যবহার করে খাবার বানায় এবং গরম করে। বায়ু প্রদূষণের ফলস্বরূপ প্রায় ২০ লক্ষ লোক অসময়ে মৃত্যুর শিকার হয়ে যাচ্ছে। শহরে অন্য প্রদূষণের জন্য বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ লোক মারা যায়।

জৈব বিবিধতা : বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে পৃথিবীতে আনুমানিক ১.৭.৫ লক্ষ প্রজাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানিয়েছেন। যদিও convention on Biological Diversily (CBD)-র মতে পৃথিবীতে প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৩০ লক্ষ। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসের একটা গবেষণা থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীতে বর্তমানে জৈব বিবিধতা কমে যাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে সংক্রামক রোগের প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, মনুষ্য প্রজাতিকে রক্ষাকারী buffer species-গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ নানারকম সংক্রামক রোগের শিকার হয়ে চলেছে।

প্রবাল প্রাচীর : প্রবাল প্রাচীর সমুদ্রের বড়জোর ০.২ শতাংশ অধিকার করে আছে, কিন্তু ২৫ শতাংশ সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন নির্মাণ এবং জীবনধারণ হয় এই প্রবাল প্রাচীর-কে কেন্দ্র করে। সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্য এটি একটি খাদ্যস্রোত। অপরদিকে উন্নয়নশীল এবং বিকাশশীল দেশগুলির সমুদ্র তটবর্তী বেশ কিছু মানুষের জীবিকার উৎস এটি। ক্যান্সারের এবং

ব্যথা কমানোর ওষুধও এই প্রবাল প্রাচীর থেকে পাওয়া যায়। এতকিছু সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ১০ শতাংশ প্রবাল প্রাচীর নষ্ট হয়ে গেছে এবং আরও ৬০ শতাংশের অস্তিত্ব বিপন্ন।

মরুভূমিকরণ : আন্টার্কটিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সব মহাদ্বীপে মরুভূমিকরণ প্রক্রিয়া চলছে। পৃথিবীর মোট ভূমিখণ্ডের ৪১ শতাংশ শুষ্কভূমি। এই শুষ্কভূমিতে বহু লোক বসবাস করে। এই জমিগুলি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যসঙ্কুলানের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ঘাসে ঢাকা জমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করা হয়েছে। এই জমিতে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি না হলে খরা পরিস্থিতির তৈরি হয়। এইভাবে বছরে প্রায় ১ শতাংশ জমি কৃষি-অযোগ্য হয়ে ধীরে ধীরে মরুভূমিকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন : প্রতিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নাল Nature- এর মতে আগামী পঞ্চাশ বছরে পৃথিবী থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ স্থলচর জীব প্রাকৃতিক কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পরিবেশ এবং বিকাশ মানবসমাজের উন্নতির দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। একটিকে বাদ দিলে আমাদের সভ্যতার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে Green Economy বা হরিৎ অর্থব্যবস্থা একটি সুন্দর বিকল্প হিসাবে আমাদের সামনে আসছে। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে বিকাশ ও পরিবেশ দুটিকেই আমরা সমান গুরুত্ব দিতে পারি।

ভবন নির্মাণ : বাড়ি, কার্যালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি জায়গায় আমরা ইন্ধন সাশ্রয়কারী যন্ত্রপাতি লাগাতে এবং ব্যবহার করতে পারি। ঘরের ভেতরের সাজসজ্জা এমন হওয়া উচিত যাতে তা পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

জঙ্গল সংরক্ষণ : বন-জঙ্গল যথেচ্ছভাবে কেটে ফেলার জন্য বর্তমানে প্রায় ২০ শতাংশ Green House Gas emission বেড়ে গেছে, সেজন্য বন-জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদেরই। জঙ্গলের ক্ষতি করে যেসব উপকরণ মনুষ্যসমাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে।

পরিবহণ : নিজস্ব পরিবহণ ব্যবহার কম করে সার্বজনীন পরিবহণ ব্যবহার করার অভ্যেস তৈরি করলে অর্থ এবং ইন্ধন দু-য়েরই সাশ্রয় হবে।

জল : আমরা প্রত্যেকেই যদি সুচিন্তিতভাবে, যত্নের সঙ্গে জলের ব্যবহার করি তাহলে জলের অপচয় অনেকটাই বন্ধ করতে পারি।

পর্যটন : বাইরে বেড়াতে যাবার সময় স্থানীয় জিনিস কিনলে এবং ব্যবহার করলে পর্যটন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং বিকাশ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও নিষ্ঠাসহকারে পালন করা হয়। পৃথক পৃথক বাহনের পরিবর্তে একসঙ্গে দল বেঁধে একটি বড় বাহনে চড়ে বেড়ানোর আনন্দ অনেক বেশি হয় এবং ইন্ধনের অপচায় অনেকটাই কম করা যায়।

অবশিষ্ট : কোনো জিনিস ফেলে দেওয়ার সহজ অর্থ হলো ওই জিনিসটি পুনর্ব্যবহারের সুযোগটুকু শেষ করে দেওয়া এবং Landfill-এর সময় মিথেন নাম হানিকারক একটি গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া। উদ্বৃত্ত জিনিসগুলি নানাভাবে বারংবার ব্যবহার করার অভ্যেস তৈরি করতে পারলে ওই জিনিসগুলির পুনরায় উৎপাদন করার খরচ এবং প্রয়োজন দুটিই কমে যায়।

এর সঙ্গে ওই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগে এমন প্রাকৃতিক উপকরণগুলি রক্ষা পায় এবং মিথেন গ্যাস উৎসর্জনের (emission) আশঙ্কাও কমে যায়।

বুদ্ধিমান উপভোক্তার দায়িত্ব : একজন বুদ্ধিমান উপভোক্তা দৈনন্দিন জীবনে এমন কোম্পানির জিনিস ব্যবহার করবেন যেগুলি প্রকৃতি থেকে ন্যূনতম কাঁচামাল নিয়ে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে উৎপাদন করা যায় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ দূষিত না হয়।

সুতরাং, প্রকৃতি ও পরিবেশকে আমরা যেমনভাবে ব্যবহার করব প্রতিফল ঠিক সেইরকমই পাব। সেজন্য যত্ন এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে আমরা যেন আমাদের ধরিত্রী মাতাকে রক্ষা করি। কারণ এই ধরিত্রীমাতা আমাদের সবার আশ্রয়স্থল। ▮

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর,

জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

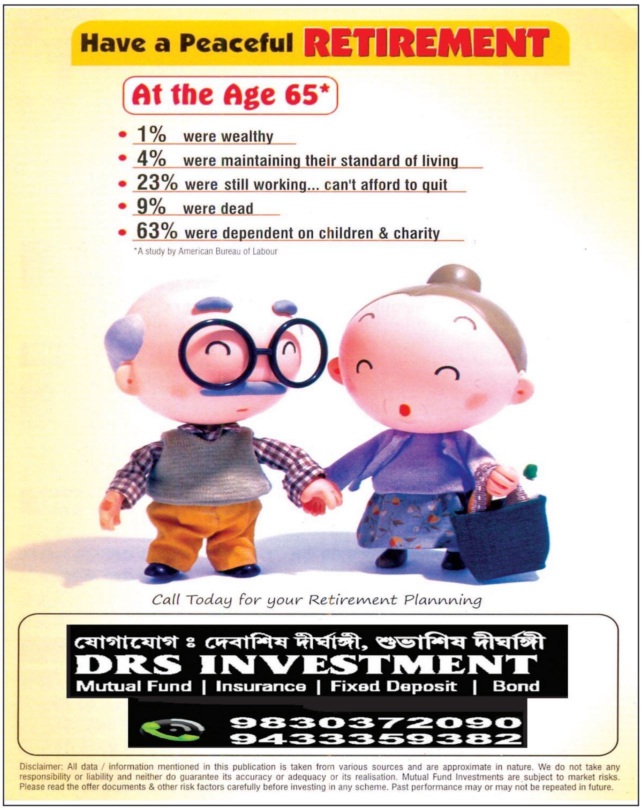

অন্য রকম

ফসলের বদলে সৌরবিদ্যুৎ

নিজের জমিতে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশে জগদেও সিংহ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখনও কৃষিকাজের জন্য প্রকৃতির মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। অতি বর্ষণ বা খরায় কখনো কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়। ফলন ঠিকমতো হলেও কখনও বা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না কৃষকরা। তাই প্রায়ই কৃষকের আত্মহত্যা করার খবরে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মধ্যে কোনো কোনো কৃষক জমিতে শুধুমাত্র ফসল না ফলিয়ে অন্য কিছুও উৎপাদন করছেন। এরকমই একজন ব্যতিক্রমী কৃষক পাঞ্জাবের মুক্তসর এলাকার ভাগসর গ্রামের জগদেও সিংহ।

জগদেও সিংহ তাঁর ১২ একর জমিতে 'জহরলাল নেহরু সোলার মিশন'-এর আওতায় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি গড়ে ৫৫০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন। গরমকালে ৯০০০ ইউনিট পর্যন্ত উৎপাদন হয়। শীতের সময় রোদের তাপ কম থাকার কারণে উৎপাদন কম হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা ভেবেই তিনি গম, ভুট্টা চাষের বদলে ৩ বছর আগে তাঁর ১২ একর জমিতে সোলার প্রজেক্ট বসিয়েছেন। তাঁর নিজের চাহিদা মিটিয়ে কেন্দ্র সরকারকে ১৭ টাকা ৯০ পয়সা দরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করছেন। কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর ২৫ বছরের চুক্তি হয়েছে। তাঁর নিজের গ্রামে প্রতি ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিচ্ছেন নামমাত্র দামে। তাঁর কথায়, "এক একর জমি ফসল ফলানোর জন্য ঠিকা দিলে খুব বেশি হলে ৫০ হাজার টাকা ঘরে আসবে। কিন্তু ১২ একর জমির ওপর সোলার প্রজেক্ট বসানোর ফলে প্রতিদিন বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৫০০ ইউনিট। পাঞ্জাব সরকারের ৮.৪০ পয়সা প্রতি ইউনিটের দাম ধরলে প্রতিদিন আয় ৪৬,২০০ টাকা। ফসল যতক্ষণ না ঘরে তোলা হচ্ছে ততক্ষণ দুশ্চিন্তা থেকে যায়। কিন্তু এই সোলার প্রজেক্ট একবার জমিতে বসালে সারা জীবনের চিন্তা দূর হয়ে যায়। ছোট কৃষক বড় কোম্পানিকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ঠিকা দিলেও লাভ হবে।"

নিজের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে জগদেও সিংহ পাশের গ্রাম লকখেবালীতেও ১০ একর জমি ঠিকা নিয়ে ২ মেগাওয়াটের প্রজেক্ট বসানোর কাজ শুরু করেছেন। এরজন্য পাঞ্জাব এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পেডা)-র সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এখান থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পাঞ্জাব সরকারকে ৮ টাকা ৪০ পয়সা দরে প্রতি ইউনিট বিক্রি করবেন। জগদেও সিংহ জানান, এক সময় প্রতি মেগাওয়াট প্রজেক্টের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ হোত। কিন্তু এখন প্রায় ৭ কোটিতেই ১ মেগাওয়াটের প্রজেক্ট বসানো যাচ্ছে।

পাঞ্জাবের মালোয়া এলাকায় সৌরশক্তির রেডিয়েশন বেশি থাকায় সোলার প্রোজেক্ট খুবই উপযোগী। সেজন্য এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ভালো চলছে। এখন মুক্তসর, মানসা ও ফাজিলকা জেলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২৮টি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চলছে।

এই পরিকল্পনা আপনার মাথায় এল কীভাবে? প্রশ্ন করা হলে জগদেও সিংহ বলেন, প্রথমে এই প্রজেক্ট খুবই খরচের ব্যাপার ছিল। এখন অনেক সস্তা হয়েছে। প্রায় ৪ বছর আগে আমার ছেলে স্পেনে গিয়েছিল। ওখানে সে দেখেছে, কৃষকরা জমিতে বিদ্যুৎ ফলাচ্ছে। দেশে ফিরে তার উৎসাহেই আমি এই কাজ শুরু করি। এ ব্যাপারে আমার পুত্রও আমাকে সবসময় সহযোগিতা করে।"

তিনি আরো জানান, "আমি চীন, আমেরিকা, তাইওয়ান এবং জার্মানির টেকনোলজি ব্যবহার করেছি। সোলার প্যানেল তাইওয়ান থেকে এনেছি। প্রজেক্ট ইনস্টল করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার স্পেন থেকে এসেছিল। এখন নতুন ১০ একর জমির জন্য টেকনোলজি ও ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্গালুরু থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। আগে এক প্যানেল থেকে ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হোত, কিন্তু এখন নতুন টেকনোলজিতে ৩২০ ওয়াট উৎপন্ন হচ্ছে।"

একটু হাসি হাসি মুখে তিনি বললেন, "আমি প্রতিদিন ৫৫০০ ইউনিট থেকে ৩টি ঘরযুক্ত ৫৫ বাড়িতে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা করার মনস্থির করেছি।"

কয়েকদিন আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাঞ্জাবের কৃষকরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষকরা জগদেও সিংহের সঙ্গে দেখা করছেন তাঁর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। ∎

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

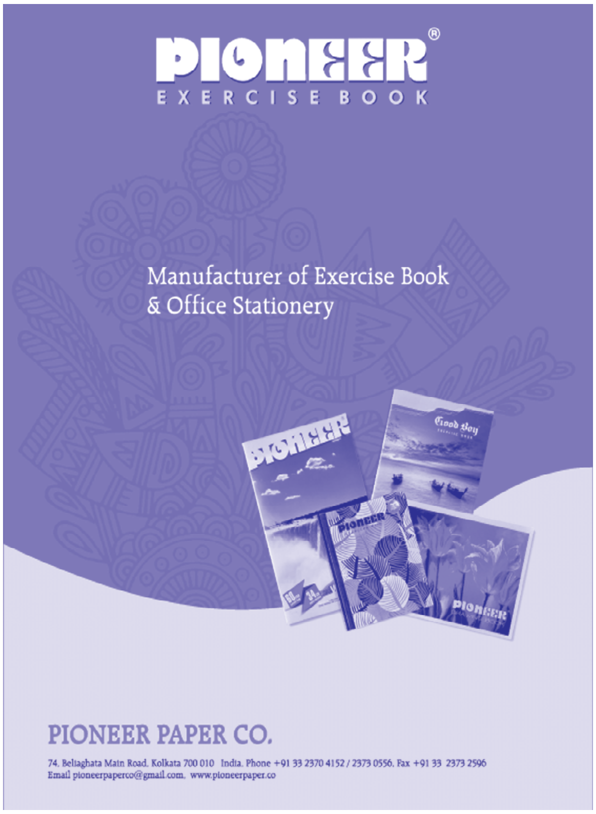

" সাধ্বোচিত একাগ্রতা নিয়ে বাঙ্গালী পত্নী তাঁর পতিকে ভক্তি করেন, সন্তানসন্ততি ও পরিবারবর্গের সেবা করেন। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ পাশ্চাত্যের যে কোন রমণীর ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্মতৎপর। রাজপুত রাজ্ঞী স্বজাতির অপ্রতিহত সাহসের জন্য গর্বিত এবং সেজন্য তিনি চিতাগ্নি পর্যন্ত স্বামীকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। মাদ্রাজের নারী আধ্যাত্মিক জীবনের ধ্রুবতারা লাভের জন্য কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করেন। "

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির প্রাদেশিক অধিবেশন

গত ১৬ ও ১৭ মে ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির প্রান্তীয় অধিবেশন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কলকাতার বালিগঞ্জস্থিত 'শ্রীনাথ হল'-এ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। প্রধান অতিথি হিসেবে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার কার্যকরী সম্পাদক ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে, বিশেষ

শ্রীমোতিলাল সোনী (বাঁ দিকে বসে) ও শ্রীবসন্তরাও বাপটকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

অতিথি হিসেবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেক্রেটারি পূজ্যপাদ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. নিখিলেশ গুহ। দুইদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বেদপুরাণ অন্তর্গত ইতিহাস, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবদান, ভারতীয় সমাজজীবনে জনজাতির ভূমিকা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মারক বক্তৃতামালায় 'ধর্ম, বিজ্ঞান এবং জাতীয়তাবাদ' বিষয়ক আলোচনা, সমাজ গঠনে স্বামী প্রণবানন্দ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অবদান এবং সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, শিবপুরস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (IIEST) ডিরেক্টর তথা বর্তমান উপাচার্য অজয় রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায়, ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটির বর্তমান রিজিওনাল ডিরেক্টর ড. সুজিত ঘোষ, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. চিত্তব্রত পালিত, ড. রীণা ভাদুড়ী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক অমিতাভ সেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্যনির্বাহি সম্পাদক প্রদীপ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির প্রবীণ কার্যকর্তা বসন্তরাও বাপাট এবং মোতিলাল সোনীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভার প্রারম্ভে দেশাত্মবোধক গান এবং সভাশেষে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্থার ভারতীর শিল্পীবৃন্দ। ■

মঙ্গলনিধি

কলকাতায় গড়িয়ার স্বয়ংসেবক অভিরূপ দাসের শুভবিবাহ উপলক্ষে গত ১৩ মে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা মিহির দাস মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা ভারতীর সহ-সভাপতি সীতেশ ভট্টাচার্যের হাতে। অনুষ্ঠানে কিংশুকপল্লব বিশ্বাস ও সুব্রত চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের ভাগ কার্যবাহ রাজেশ রায়চৌধুরীর মা করুণাদেবী গত ১৭ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

কলকাতায় আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

কলকাতা জে বি রায় আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজে গত ৮ থেকে ১৬ মে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন ২ ঘণ্টা চলা এই সম্ভাষণ শিবিরে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের সহজ সরল পদ্ধতিতে সংস্কৃতে কথা বলা শেখান সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তা বিশ্বজিৎ প্রামাণিক। সম্ভাষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় মেডিক্যাল কলেজের সভাকক্ষে। পরিপূর্ণ সভাকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষায় নাটিকা, গান, হাস্যকৌতুক পরিবেশন করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ উৎপলেন্দু জানা-সহ অন্য অধ্যাপকগণ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিভিসি-র ইঞ্জিনিয়ার তথা সংস্কৃত ভারতীর কার্যালয় প্রমুখ পবন কুমার। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিমানবন্দরের মহাপ্রবন্ধক শান্তারাম ভাস্কর ভট্ট। বক্তাগণ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্ প্রতি বছরের মতো এবছরও কলকাতার বইপাড়ায় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রকে বসে বৈঠক আড্ডার আয়োজন করেছিল। সাহিত্যিক শেখর সেনগুপ্তকে তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ পুরস্কারে সম্মান জানানো হয়। এইদিন ড. বিজয় আঢ্য লিখিত 'পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে' গ্রন্থটি উন্মোচন করেন কলকাতা ভারতীয় যাদুঘর ও জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। এছাড়া সাহিত্য পত্রিকা 'অর্পণ'-এর উন্মোচন করেন কবি তরুণ সান্যাল। একেবারে ডানদিকে দাঁড়িয়ে প্রিটোনিয়ার কর্ণধার পিনাকী দে।

‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১০ মে সন্ধ্যা ৫টায় সিউড়ী নগরের প্রবীণ নাগরিক সুষমা চৌধুরী, সকলের ‘বড়মা’ তথা সেবাপ্রয়ণা মাকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান চৌধুরী পরিবারের ভদ্রাসনে অনুষ্ঠিত হয়। তিনবার ‘ওঁ’ ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলন দ্বারা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংস্কার ভারতীর সিউড়ী শাখার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তথা সিউড়ী নগরের প্রবীণ নাগরিক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রভাত চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাকলী দাস, প্রীতিকণা ভট্টাচার্য ও সুষমাদেবীর পুত্রবধূ বনানী চৌধুরী। সুষমা দেবীকে পূজা ও আরতি করেন বনানী চৌধুরী ও শ্রদ্ধার পক্ষে তুলসী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে নগরের শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাশীল অনুদানী ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন বীরভূম জেলা সভাপতি তথা বর্তমানে সরস্বতী শিশুমন্দিরের জেলা সমিতির সভাপতি শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন পতিতপাবন বৈরাগ্য।

পরাবর্তন অনুষ্ঠান

গত ১৭ মে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে এক পরাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী নীলাঞ্জনানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ১৭টি পরিবারের ৬৮ জন এদিন স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। পরাবর্তনের পর তাঁরা বলেন, এক সময়ে তাঁরা লোভের বশবর্তী হয়ে এবং প্রলোভনে হিন্দুধর্ম থেকে খৃষ্টধর্মে চলে গিয়েছিলেন। কিছু পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে স্বধর্মে ফিরে এলেন এবং তার জন্য তাঁরা আনন্দ অনুভব করছেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্ত্রপাঠ এবং শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে যাঁরা হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন তাঁদের নতুন বস্ত্র এবং প্রসাদের ব্যবস্থা করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ২০০ জন মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং নাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন মালদা বিভাগের ধর্মজাগরণ প্রমুখ গণেশ সোরেন এবং প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ধর্মজাগরণ এবং সমন্বয় বিভাগ, মালদা জেলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাঁরা হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন তাঁরা প্রত্যেকে মালদা কোর্টে এফিডেভিট করেছেন।

পরলোকে গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার প্রাক্তন জেলা সঙ্ঘচালক মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং আসানসোল জেলার বর্তমান সঙ্ঘচালক মদন চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায় গত ২৩ মে বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়ার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৭ পুত্র, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বেশ কয়েক বছর আগেই প্রয়াত হন। তাঁর অন্য পুত্র ও নাতিরাও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। কনিষ্ঠপুত্র সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলা সেবা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। আরেকপুত্র কেদার চট্টোপাধ্যায় শিশুমন্দির পরিচালন সমিতির দায়িত্ব পালন করছেন। স্বস্তিকা পত্রিকার তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবকদের মাতৃস্বরূপা ছিলেন।

শচীনকর্তা ও বাংলা গান

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

'মন দিলো না বঁধু, মন নিলো যে শুধু। আমি কি নিয়ে থাকি'— নাকে বেঁধে যাওয়া সুর অথচ মধুময়, কে শোনেনি এই গান? এ গানের শিল্পী বাংলার শচীনকর্তা। কুমিল্লার ছেলে, কিন্তু সারা ভারতকে গানের সুর দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। খটখটে মেজাজের মানুষ শচীনকর্তা। রাগপ্রধান গানের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সংমিশ্রণে নির্মাণ করেছিলেন গানের এক ভিন্ন ধারা। ধ্রুপদ ও ফোকের এই সংমিশ্রণে বাংলা গান ধ্রুপদী ঘরানার আঙ্গিক থেকে সহজ পথে এসেছিল সাধারণ মানুষের ভেতরে। শুধু বাংলা গান কেন, হিন্দি গানের সুর ধারায় তিনি নতুনত্ব সংযোজন করেছিলেন। শচীন দেববর্মণ কতটা মেধাবী ছিলেন সেটা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে তাঁর সময় ও তাঁর প্রতিযোগীদের। শচীন দেববর্মণের সঙ্গে গান করতেন বিখ্যাত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানা-কেষ্ট নামে যার পরিচিতি, মান্না দের কাকা এবং গানের গুরুও তিনি), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ওস্তাদ বাদল খান। এছাড়াও তাঁর বন্ধু হিমাংশু দত্ত, তারাপদ চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, অজয় ভট্টাচার্য-সহ বাংলা গানের সব গুণী শিল্পী তখন দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে বাংলা গানের চর্চা করে যাচ্ছেন। এ সময় তার নিজেরই সুরে গাওয়া দুটি বাংলা গান শ্রোতাদের আন্দোলিত করে যাচ্ছে। গান দুটি হচ্ছে— 'এই পথে আজ এসো প্রিয়া' ও 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানের পরে'। এরপর একের পর এক রাগাশ্রয়ী বাংলা গান শচীনকর্তাকে নিয়ে যায় বহুদূর। সেই গানের মধ্যে রয়েছে— আলো ছায়া দোলা, আমি ছিনু একা, মধু বৃন্দাবনে, না আমারে শশী চেয়ে না, বিরহ বড়ো ভালো লাগে ইত্যাদি গান। শ্রোতা তখন বিহ্বলিত— কোনটা ছেড়ে কোনটা শুনবে বুঝে উঠতে পারছিল না, ঠিক এমন সময় তিনি পাড়ি জমান মুম্বইয়ে। সেখানে তাঁকে বিশাল প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়। কারণ হিন্দি গানের ডাকসাইটে সঙ্গীত পরিচালকরা তখন পুরো ফর্মে। এসব পরিচালকের মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন প্রতাপশালী সব সঙ্গীত পরিচালক। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন— শঙ্কর জয়কিষান, ও পি নাইয়ার, মদন মোহন, নৌশাদ, শ্রীরামচন্দ্র, অনিল বিশ্বস, সাজ্জাদ হোসেন, রোশান (ঋত্বিক রোশনের ঠাকুরদা) ভি বালসারা, ঠাকুর ওঙ্কারনাথ, ভীমসেন যোশী প্রমুখ।

আর এর মধ্য দিয়েই শচীন দেববর্মণ গড়লেন তাঁর নিজস্ব বৃত্ত। শক্তি সামন্তর ছবি 'সুবহ প্যার কি' র মাধ্যমে শচীন দেববর্মণের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এই ছবিতে সুপারস্টার হলেন দুজন— অভিনয় করে

রাজেশ খান্না আর গান গেয়ে কিশোরকুমার। ২০ বছর পেছন থেকে লাফ দিয়ে টপকে গেলেন কিশোরকুমার, সামনে চলে এলেন মহম্মদ রফিকে ছাড়িয়ে।

শচীন দেববর্মণের হাত ধরেই কিশোরকুমার এক নতুন যুগের সূচনা করলেন ১৯৬৯ সালে। শচীন দেববর্মণের স্বকীয়তা যেটা মুম্বই সঙ্গীত পরিচালকদের ধাক্কা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে— তারা যখন মেলেডি লাইনের বাইরে ভাবতে পারছে না, ঠিক তখনই শচীনকর্তার রকমারি তালের ব্যবহারে এবং যন্ত্রানুষঙ্গের মাপ মত প্রয়োগ অন্যদের চেয়ে আলাদা করে দিয়েছিল তাঁকে। যার প্রয়োগ দেখা যায় 'চিতোর বিজয়', 'দিল কি রানী', 'দো ভাই' অর্থাৎ ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ এর 'চুপচুপকে' এবং 'মিলি' পর্যন্ত তিনি দেখিয়েছেন তাঁর বিশেষত্বকে। শচীন দেববর্মণ কত শক্ত শিরদাঁড়াওয়ালা শিল্পী ছিলেন সেটা আরেকটি ঘটনাও বোঝা যায়।

এক জেদের কারণে তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘসময় লতাকে (লতা মঙ্গেশকর) দিয়ে গান করাননি। কারণটা ছিল— 'সিতারো কি আগে' সিনেমার রেকর্ডিং-এর একটি গান শচীন কর্তার পছন্দ না হওয়ার পরে আবার সেটিকে তিনি রেকর্ড করতে বলেন। কিন্তু লতার সেসময় ডেট নেই, বিদেশে চলে যাবার কথা। লতার অসুবিধার কথা শুনেই শচীনকর্তা চটে যান এবং বলে দেন 'দরকার নেই তাঁকে'। লাভটা যদিও হয়েছিল আশা ভোঁসলের। তখনকার হিট ছবি— 'চলতি কা নাম গাড়ি', 'কাগজ কা ফুল', 'সুজাতা', 'বোম্বাই কা বাবু', 'কালাবাজার', 'মাঞ্জিল'— এই সময়ের সব ছবিতেই তখন আশা। ১৯৫১ সালের পর গীতা দত্তের দুঃখী গানের ইমেজ ভেঙে বাজি, পিয়াসা, সুজাতায় ভারতীয় সিনেমায় যেমন খুঁজে

পেয়েছিল একজন গীতা দত্তকে, শচীনকর্তার হাতে পড়ে আশা ভোঁসলে হয়ে যান গীতা দত্তের সার্থক উত্তরসূরি। ১৯৮৩ সালে 'বন্দিনী' থেকে আবার ফিরে আসেন লতা। শচীনকর্তার নীতি ছিল কম কাজ অথচ ভাল কাজ। এই আদর্শ নিয়েই তিনি দখল করেছিলেন ভারতের সঙ্গীতের স্বর্ণদ্বার।

কলকাতায় থাকার পরেও এই বরেণ্য শিল্পী কখনও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যেতেন না। এর জন্য যথাযথ কারণও ছিল। তাঁর বাবা নবদ্বীপচন্দ্র যে পিতৃব্যর হাতে বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন, ত্রিপুরার রাজা সেই বীরচন্দ্রের আতিথ্য কবিগুরু বহুবার গ্রহণ করার জন্যে তাঁর অভিমান ছিল। তাই বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনি বর্জন করেননি। বরং বহু হিন্দি গানে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ধারার সুর ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' ছবির বিখ্যাত গান 'যায়ে তো কাঁহা' অনেকটা 'হে ক্ষণিকের অতিথি গানের মত। 'অভিমান' ছবিতেও 'তেরে মেরে মিলন কি'র মূল সুরটি তিনি নিয়েছিলেন— 'যদি তারে নাই চিনি গো সেকি' থেকে। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী মীরা দেববর্মণ ছিলেন ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, তাঁর বন্ধু ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

বন্ধু নজরুলের গান— 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী', গানটির সুরও তিনি নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'মেরি সুরত তেরি আঁখে' ছবিতে। মান্নার গলায়— 'পুছোনা ক্যায়সে ম্যানে' এক অনবদ্য সংযোজন। এই মেধাবী ক্ষণজন্মা বাঙালি জন্মেছিলেন ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর কুমিল্লায়। বেড়ে উঠেছেন আগরতলায়। শচীন দেববর্মণের পারিবারিক একটা পরিচয় রয়েছে— ঐতিহাসিকের ভাষায় বলতে গেলে বিষয়টা দাঁড়ায় এমন যে তিনি ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র বর্মণ সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। নবদ্বীপের পিতৃব্য বীরচন্দ্র তাঁকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। এই নবদ্বীপচন্দ্রের পুত্র শচীন দেববর্মণ আগরতলা রাজ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরসূরি। সে সিংহাসনে তিনি বসেননি, বরং নিজের যোগ্যতায় দখল করেছেন আরেকটি সিংহাসন। যেখানে থেকে তাঁকে কোনোদিন সরানো যাবে না। কারণ বাংলা গানের আধুনিকায়নের প্রবাদ পুরুষ ছিলেন তিনি।

'ঠিকানা ভারতবর্ষ' নাটকের একটি দৃশ্য।

সংস্কার ভারতীর প্রযোজনায় নাটক : ঠিকানা ভারতবর্ষ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস অবলম্বনে সংস্কার ভারতীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'ঠিকানা ভারতবর্ষ' নাটকটি সাদামাটা সহজসরল ভাবে প্রয়োগ ও উপস্থাপনা হয়েছে। নতুন চিকিৎসক দিশা দত্ত তার প্রথম পোস্টিং হয় এক প্রান্তিক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। যেখানে নেই সেরকম চিকিৎসার উপকরণ, সাজসরঞ্জাম। নবীনা ডাক্তার দিশা দত্ত দিশাহীন হয়ে পড়লেও আশা হারায় না। নাটকটির পটভূমি উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রাম হরিপুর।

পদে পদে নানা প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হয়েও সে হতদরিদ্র অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলির পাশে থাকার একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। একদিন ঝড় জলের রাতে গুলিবিদ্ধ তথাকথিত উগ্রপন্থীর চিকিৎসা করে অনেকটা মানবিকতার কারণে। প্রায় আদিম পদ্ধতিতে ড. দিশা ফোঁড়া কাটার ছুরি দিয়ে আহত মানুষটির গুলি বের করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। নাম পরিচয় জানতে চাইলে তারা বলে ওঠে ওর নাম স্বাধীনতা সৈনিক, ঠিকানা ভারতবর্ষ। দিশা স্তম্ভিত হয়ে ওঠে। নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে দিশা নতুন করে আবিষ্কার করে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি একবিংশ শতকের ভারতবর্ষকে। এই বার্তাটিই নাটকের মূল ইউ.এস.পি।

অভিনয় দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় প্রায় সব শিল্পীই নবাগত। আধুনিক নাটকে নবাগতদের দিয়ে অভিনয় করানোর উদ্যোগটা স্বাগত। বিকাশ ভট্টাচার্য সাহসটা দেখাতে পেরেছেন। বর্তমানে অনেক নাট্যদলই নিজেদের সদস্যদের দিয়ে অভিনয় না করিয়ে অন্যদলের ভাড়া করা শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করাচ্ছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি দলগত সংহতির পরিচয় দিলেন সন্দেহ নেই। অভিনয়ে ডাঃ দিশা চরিত্রে উপাসনা আরও দৃপ্ত ও দৃঢ় হলে ভাল হয়। ডাঃ সূর্য দত্তের ভূমিকায় সিদ্ধার্থ সাহা কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। সূর্য দত্তের মায়ের চরিত্রে সবিতা দে মমতাময়ী শাশুড়ির ভূমিকাটা বেশ ভালভাবে নির্বাহ করেছেন। এছাড়া আর যাঁরা নজর কেড়েছেন তার মধ্যে সুচেতনা চরিত্রে সংহিতা পতি ও দারোগা চরিত্রে প্রদীপ দাস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শুভরূপা চ্যাটার্জি, সুকুমার পতি, পাঁচুগোপাল দে চেষ্টা করে গিয়েছেন। আবহ, আলোকসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা যথাযথ। ▮

শব্দরূপ-৭৪৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

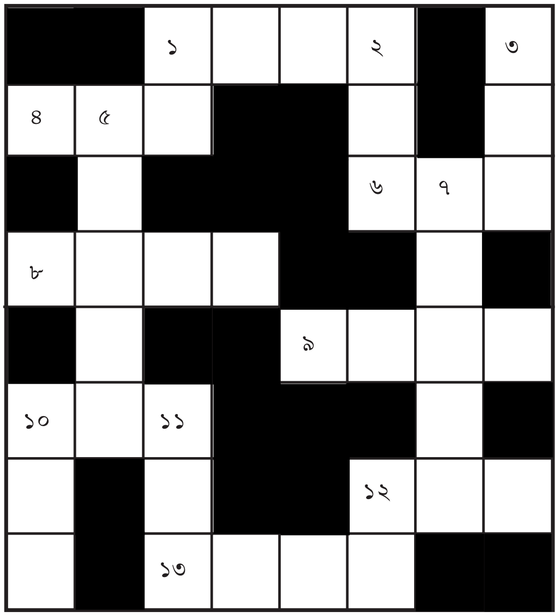

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মহালয়া থেকে কালীপুজোর আগের দিন পর্যন্ত যখন দেবী দুর্গার আরাধনা হয়, **৪.** গোবর, **৬.** সঙ্গীতের তালবিশেষ, **৮.** বলদ, **৯.** রাজা রাজবল্লভের কীর্তি—, ধ্বংসকারিণী পদ্মানদী, **১০.** সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান, **১২.** বৃক, **১৩.** "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন—"।

উপর-নীচ : ১. দানের যোগ্য, **২.** রাত্রি, **৩.** বিরাট রাজকন্যা, অভিমন্যু পত্নী, **৫.** বেদান্তবিরোধী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কে পরাজিত, **৭.** সেনাপতি, দণ্ডবিধানকর্তা, **১০.** সূর্য, অদিতি-কশ্যপের দ্বাদশ পুত্র, **১১.** বাঁশি, **১২.** মনসামঙ্গলে মনসার সহকারিণী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৬

উ		অ	ঞ্জ	না		জ	
ত্তা		ঙ্গ		র	সা	ল	
ন	গ	দ		দ		ধা	
পা					ব	রা	হ
দ	শ	ক					রি
	ক্তি		মা		বি	ক	চ
	শে	ফা	লি		ব		ন্দ
	ল		নী	র	র		ন

সঠিক উত্তরদাতা

সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৪৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ জুন ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ২৭

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
1 June - 2015 - Rs. 10.00